আল্লাহ তা‘আলার নান্দনিক নাম ও গুণসমগ্র: কিছু আদর্শিক নীতিমালা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.

অনুবাদ : মুহাম্মাদ শামসুল হক সিদ্দিক

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد شمس الحق صديق

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

প্রকাশকবৃন্দের ভূমিকা

সকল প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহ তা‘আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, ক্ষমা চাই এবং তাঁর কাছে তাওবা করি। আমাদের নিজ নফসের অনিষ্টতা এবং আমাদের আমলের অযাচিত দিকগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা‘আলা যাকে হিদায়েত দান করেন তাকে পথচ্যুত করার কেউ নেই; আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়েত করার কেউ নেই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

‘আল্লাহ তা‘আলার নান্দনিক নাম ও গুণসমগ্র: কিছু আদর্শিক নীতিমালা’ শীর্ষক গ্রন্থটিতে এমন কিছু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যা পাঠকের বিশ্বাসে যোগ করতে পারে নতুন মাত্রা, তার বিশ্বাসকে পৌঁছে দিতে পারে স্বচ্ছতার শীর্ষে। উদাহরণত, আমাদের অনেকেই এ বিশ্বাস পোষণ করে থাকি যে, আল্লাহ

তা‘আলা সত্তাগতভাবে মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছেন। এটি একটি অবান্তর ধারণা যা শুধরিয়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উক্ত বিষয়সহ আল্লাহ তা‘আলার নামসমগ্রের প্রতি বিশ্বাসের ধরন-ধারণ কী হবে তা বিশ্লেষণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রখ্যাত ইসলামী শরীয়তবিদ প্রয়াত শায়খ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উসাইমীন রাহেমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটি আরবী থেকে ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেন জনাব ফয়সল শফীক। তিনি ইংরেজি সংস্করণের নাম দিয়েছেন- ‘The Beautiful Names and Attributes of Allah: Important Principles to Remember’ আমেরিকায় যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা-বিশ্বাস বিস্তারিতভাবে জানতে চান তাদের কাছে অনুবাদগ্রন্থটি অন্ত্যন্ত প্রিয়। বইটির বাংলা সংস্করণ তৈরি করা যায় কি-না সে ব্যাপারে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা শামসুল হক সিদ্দিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উছাইমিন রাহেমাহুল্লাহ-এর লেখা মূল

আরবি সংস্করণটি সংগ্রহ করে সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেন। বইটি তাত্ত্বিক আলোচনা-নির্ভর হওয়ায় এর বাংলা সংস্করণ তৈরি করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। মাওলানা শামসুল হক সিদ্দিক এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক মাওলানা আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান বইটির পাণ্ডুলিপি পড়েছেন এবং আমাদের সার্বিক সহযোগিতায় আবহাস-এর পক্ষ থেকে বইটি প্রকাশ করার জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন বলে তাকে ও আবহাসের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই অনুবাদকর্মটি কবুল করেন এবং আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন (এফ.সি.এ)

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

রফিকুল হক রঞ্জু

টেক্সাস, হিউস্টন, আমেরিকা

৩০ আগস্ট ২০১৩

অনুবাদকের ভূমিকা

আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা একটি অনিবার্য বিষয়। আকীদা-বিশ্বাস অস্বচ্ছ বা অযথার্থ হলে আমল ও আচার-অনুষ্ঠানগত একনিষ্ঠতা, ত্যাগ ও কুরবানী গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, এ বিষয়টি আমাদের সকলেরই জানা। তবু দেখা যায় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। বরং প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকেই তারা আকীদা-বিশ্বাস হিসেবে ধারণ করে চলেন। পক্ষান্তরে আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিটি উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রেই আমাদের হতে হবে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল, সমধিক গুরুত্বারোপকারী ও ঐকান্তিক। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়াত, (ইবাদত) রুবুবিয়াত (প্রভুত্ব), আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা তাওহিদ বলতে আমরা যা বুঝি, তা এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অতএব এ

ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতির অর্থ মূল বিশ্বাসের জায়গাটি ত্রুটিপূর্ণ থাকা, যা কোনোভাবেই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলার আসমা ও সিফাত তথা নাম ও গুণসমগ্রের ব্যাপারে আমাদের কী ধরনের বিশ্বাস পোষণ করতে হবে সে ব্যাপারে গবেষণাধর্মী কোনো বই বাংলা ভাষায় এখনো আমার নজরে পড়েনি। অতএব ঈমানী তাগিদ থেকেই আমি অনুভব করি যে, প্রখ্যাত শরীয়তবিদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল উছাইমীন র. রচিত **'আল কাওয়িদুল মুছলা ফী সিফাতিল্লাহি তা'আলা ওয়া আসমাইহিল হুসনা'** গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত। আর তাই বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রস্তাব আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করি।

হানাফী মাযহাবের মূল বিশ্বাসের সঙ্গে বইটিতে উল্লিখিত বক্তব্যমালার কোনো সংঘর্ষ নেই। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌল আকীদা বলে স্বীকৃত।

মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন (এফ.সি.এ) এবং হিউস্টন প্রবাসী সর্বজনাব শহীদুল ইসলাম, রফিকুল হক রঞ্জু বক্ষ্যমাণ বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় অশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখেন। আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটির সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, বিশেষ করে মাওলানা আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান, মাওলানা ইকবাল হোসাইন মাছুম, মাওলানা চৌধুরী আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা আখতারুজ্জামান ও মাওলানা কামাল উদ্দিন মোল্লা বইটি আবহাসের পক্ষ থেকে প্রকাশের সম্মতি জ্ঞাপন করায় তাদের সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক দো'আ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

সভাপতি ও মহাপরিচালক

আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি

ইদ্রিস টাওয়ার, টংগী কলেজ গেট, টংগী, গাজীপুর।

৩০ আগস্ট ২০১৩

শায়খ আল্লামা আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায র. এর ভূমিকা

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد،

'আল্লাহ তা'আলার নান্দনিক নাম ও গুণসমগ্র: কিছু আদর্শিক নীতিমালা' শিরোনামে আমাদের সম্মানিত ভাই আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল উসাইমীন রচিত মূল্যবান গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি শুনেছি। এ এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ। এতে আছে আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণসমূহের ব্যাপারে সালাফদের আকীদার বর্ণনা, আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতিমালা এবং খুব উপকারী কিছু আলোচনা। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের 'সঙ্গে থাকা'র অর্থ কি লেখক তা ব্যাখ্যা করেছেন, হোক তা সুনির্দিষ্টভাবে সঙ্গে থাকার

বিষয় উল্লিখিত হওয়ার ক্ষেত্রে অথবা অনির্দিষ্টভাবে সঙ্গে থাকার বিষয় উল্লিখিত হওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি বলেছেন যে এ 'সঙ্গে থাকা'র যে প্রকৃত অর্থ রয়েছে সে অনুযায়ী তা হক ও সত্য। আর এ 'সঙ্গে থাকা' মাখলুকের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকা বা মিশে থাকাকে দাবি করে না। পবিত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বরং আরশের ওপরে- যেভাবে তিনি নিজ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহুর জন্য উপযোগী ঠিক সেভাবে- আছেন বরং এ 'সঙ্গে থাকা'র অর্থ হলো, বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সম্যক জ্ঞান ও অবগতি এবং সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ। তাদের কথাবার্তা ও নাড়াচাড়া শোনা। তাদের অন্তর্গত ও বহির্গত অবস্থা দেখা। তাঁর রাসূলগণ ও মুমিনদের হিফাজত করা ও সুরক্ষা দেওয়া। তাদের সাহায্য করা ও তাওফিক দেওয়া ইত্যাদি।

এ গ্রন্থে আরো আছে বাতিলপন্থীদের আকীদা বিশ্বাসের খণ্ডন ও প্রতিবাদী বিশ্লেষণ। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তার ছাওয়াব বাড়িয়ে দিন, আমাদেরকে ও তাকে আরো অধিক জ্ঞান, হিদায়েত ও

তাওফিক দান করুন। পাঠকসহ সকল মুসলিমকে এ গ্রন্থ থেকে উপকার লাভের তাওফিক দান করুন। নিশ্চয় তিনি দো‘আ কবুলের মালিক এবং প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেয়ার ব্যাপারে অতি ক্ষমতাবান।

অনুলিপি করিয়েছেন আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায- আল্লাহ তাকে মাগফিরাত দানে ভূষিত করুন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ ইবন বায

মহাপরিচালক

ইলমী গবেষণা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ বিষয়ক অফিসমূহ

৫/১১/১৪০৪ হি.

লেখকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি। আমাদের নিজ নাফসের খারাবি এবং কর্মসমূহের মধ্যে যা অসাধু তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। যাকে আল্লাহ হিদায়েত দান করেন তাকে গোমরাহকারী কেউ নেই, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে হিদায়েতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা সততার সাথে

তাঁদের অনুসরণ করেছেন তাদের প্রতি সালাত বর্ষণ করুন এবং উত্তম শান্তিতে ভূষিত করুন।

এরপর কথা হলো, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান আনা ঈমানের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি। আর সে রুকনগুলো হচ্ছে, মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ঈমান[1], তাঁর রুবুবিয়াত তথা প্রভুত্বের উপর ঈমান। তাঁর উলুহিয়াত তথা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে সেটার উপর ঈমান এবং আসমা ওয়াস্ সিফাত তথা আল্লাহর যাবতীয় নাম ও গুণাবলীর উপর যথার্থ ঈমান।

নাম ও গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে অদ্বিতীয় মানা তাওহীদের তিন প্রকারের মধ্যে একটি। আর তা হচ্ছে,

---

[1] আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টির প্রমাণ অগণিত অসংখ্য। তবে সেটা প্রমাণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিজস্ব কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যা কালাম শাস্ত্রবিদদের ব্যবহৃত নিয়মের সাথে অনেক সময়েই খাপ খায় না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য খালেদ আবদুল লতিফ মুহাম্মাদ নূর লিখিত মানহাজু আহলিস সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত ওয়া মানহাজুল আশা'য়েরা এবং আবদুর রহমান সালেহ আলে মাহমূদ রচিত মাওকাফু ইবনু তাইমিয়্যাহ মিনাল আশা'য়েরা গ্রন্থদ্বয় দেখা যেতে পারে।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ব) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ (ইবাদতের ক্ষেত্রে একত্ব) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত (নাম ও গুণের ক্ষেত্রে একত্ব)।

[দ্বীনে ইসলামে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর জ্ঞান অর্জনের মর্যাদা]

দ্বীন ইসলামে তাওহীদে আসমা ওয়াস্ সিফাত তথা নাম ও গুণসমগ্রের ক্ষেত্রে তাওহীদের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু। এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকলে তা কোনো ব্যক্তিকেই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার সুযোগ দেয় না, পক্ষান্তরে এর জ্ঞান থাকলে সে আল্লাহ তা'আলাকে সুস্পষ্ট জ্ঞানসহ ইবাদত করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমেই ডাক।" *(সূরা আল আরাফ: ১৮০)*

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নামের মাধ্যমে ডাকার যে কথাটি রয়েছে, এই ডাকা দুই প্রকার। একটি হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার জন্য ডাকা, অপরটি হলো এই নামগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার উদ্দেশে ডাকা।

চাওয়ার জন্য ডাকা

চাওয়ার জন্য ডাকার অর্থ হলো, আপনি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়ার পূর্বে এমন নাম চয়ন করবেন যা আপনার প্রার্থিত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যেমন আপনি বলবেন, 'হে ক্ষমাশীল আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, হে দয়াময় আপনি আমার প্রতি দয়া করুন, হে হিফাজতকারী আপনি আমাকে হিফাজত করুন, ইত্যাদি।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা

ইবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকার অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের যে দাবি রয়েছে সে দাবি

অনুযায়ী আপনি আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবেন। অতএব আপনি তাওবা করবেন, কারণ আল্লাহ তা‘আলা হলেন অতি তাওবা কবুলকারী। আপনি জিহ্বা ব্যবহার করে আল্লাহ তা‘আলার যিকির করবেন, কেননা তিনি সর্বশ্রোতা। আপনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবেন; কারণ তিনি সর্বদ্রষ্টা। আপনি গোপনেও আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করবেন; কারণ তিনি হলেন আল্-লাতীফ আল খাবীর অর্থাৎ অতিসূক্ষ্মদর্শী ও সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।

[এ গ্রন্থ রচনার মূল কারণ]

নাম ও গুণ বিষয়ক তাওহীদের এ মর্যাদার কারণে আর এ ব্যাপারে মানুষের, কখনো হক আবার কখনো অজ্ঞতা ও একঘেয়েমিবশত বাতিল, কথাবার্তার কারণে আমি এ ব্যাপারে কিছু নীতিমালা লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমার প্রত্যাশা তিনি যেন আমার এ আমলকে একমাত্র তাঁর উদ্দেশেই ঐকান্তিকভাবে পেশ করার তাওফিক দান করেন। আমার এ কাজকে তাঁর সন্তুষ্টির অনুগামী

বানান এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বানান। আমি এ গ্রন্থের নাম দিয়েছি:

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى

(আল্লাহর গুণাবলি ও তাঁর নামসমূহের বিষয়ে চমৎকার নীতিমালা)

লেখক

সূ চি প ত্র

ষষ্ঠ মূলনীতি: আল্লাহর নামসমূহ সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়

সপ্তম মূলনীতি: আল্লাহর নামগুলোর ব্যাপারে ইলহাদ হলো নামসমূহে যা কিছু আবশ্যক তা বিকৃত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার সিফাত তথা গুণ-বিষয়ক মূলনীতি/

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার সকল সিফাতই পূর্ণাঙ্গ এবং এতে কোনো প্রকার অপূর্ণতা নেই।

দ্বিতীয় মূলনীতি: সিফাতের অধ্যায় নামের অধ্যায় থেকে প্রশস্ততর।

তৃতীয় মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। সাব্যস্তজাত গুণ ও অসাব্যস্তজাত গুণ।

চতুর্থ মূলনীতি: সাব্যস্তজাত গুণগুলো প্রশংসা ও পূর্ণাঙ্গসূচক গুণ। অতএব এসব গুণ যত বেশি হবে এবং এসবের অর্থে যত বেশি বিভিন্নতা আসবে, যিনি এসব গুণে গুণান্বিত তাঁর পূর্ণাঙ্গতা তত অধিক প্রকাশ পাবে।

পঞ্চম মূলনীতি: সাব্যস্তজাত গুণ দু 'ভাগে বিভক্ত। আল্লাহর সত্তাসংলগ্ন গুণ ও তাঁর কর্মসংলগ্ন গুণ।

ষষ্ঠ মূলনীতি: সিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বড় দুটি নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত থাকা খুবই জরুরি। এর একটি হলো 'তামছীল' (সাদৃশ্য নির্ধারণ) আর অপরটি হলো 'তাকয়ীফ' (ধরণ নির্ধারণ)।

সপ্তম মূলনীতি: আল্লাহ তা 'আলার সিফাতসমূহ ওহীনির্ভর। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি বিবেচনার কোনো স্থান নেই।

তৃতীয় অধ্যায়: নাম ও সিফাত প্রমাণকারী দলিল-বিষয়ক মূলনীতি/

প্রথম মূলনীতি: নাম ও সিফাত প্রমাণের উৎস বা দলিল হলো মাত্র দুটি। একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

দ্বিতীয় মূলনীতি: কুরআন-সুন্নাহর শব্দসমূহকে বিকৃত না করে তার প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করা ওয়াজিব, বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার সিফাত কেন্দ্রিক শব্দমালা; কেননা এ ক্ষেত্রে মানববুদ্ধির কোনো স্থান নেই।

তৃতীয় মূলনীতি: সিফাত সংবলিত বাণীসমূহের প্রকাশ্য অর্থ এক হিসেবে আমাদের জানা আর অন্য হিসেবে আমাদের জন্য তা অজ্ঞাত।

চতুর্থ মূলনীতি: কুরআন ও সুন্নাহর টেক্সট বা ভাষ্যসমূহের বাহ্যিক অর্থ যা টেক্সট বা ভাষ্যসমূহ সামনে আসার পর তৎক্ষণাৎ মাথায় আসে। এ বাহ্যিক অর্থ কনটেক্সট বা বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক অনুযায়ী এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কথা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

[সিফাত বিষয়ে আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের মতবাদের খণ্ডন]

একটি সতর্কতা: প্রত্যেক মু'আত্তিলই মুমাচ্ছিল অনুরূপ প্রত্যেক মুমাচ্ছিলই মু'আত্তিল।

চতুর্থ অধ্যায়: আহলে সুন্নাতের উপর আরোপিত কিছু সন্দেহ ও তার অপনোদন/

প্রথম উদাহরণ: হজরে আসওয়াদ জমীনের বুকে আল্লাহর ডান হাত

দ্বিতীয় উদাহরণ: বান্দাদের অন্তরসমূহ দয়াময়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'আঙ্গুলের মাঝখানে।

তৃতীয় উদাহরণ: নিশ্চয় আমি আল্লাহ কর্তৃক বান্দাদের বিপদমুক্তি ইয়েমেনবাসীদের পক্ষ থেকে পাই।

চতুর্থ উদাহরণ: (ইস্তাওয়া এর অর্থ) "তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন"।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদাহরণ: (আরশে থাকা এবং সাথে থাকার মধ্যে সামঞ্জস্যতা) "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন।" "তার চেয়েও কম, কিংবা বেশি যাই হোক না কেন, তিনি তো তাদের সাথে রয়েছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন।"

পরিশিষ্ট: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গেই আছেন, এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত:

একটি সতর্কতা: (আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে থাকার প্রকৃত অর্থ)

আরেকটি সতর্কতা (মহান আল্লাহ উর্ধ্বে থাকার প্রমাণাদি)

আল কুরআনের প্রমাণ

সুন্নাতের প্রমাণ

যুক্তিনির্ভর প্রমাণ

পরিশিষ্ট:

সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত ‘মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ’

পত্রিকায় ছাপা প্রবন্ধের কপি

আল্লাহর নাম বিষয়ক মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহর সকল নামই অতি নান্দনিক।

অর্থাৎ সেগুলো সৌন্দর্যে সর্বশীর্ষে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। *(সূরা আল আরাফ: ৭: ১৮০)*

কারণ তা পূর্ণাঙ্গ গুনাবলীসম্পন্ন, যাতে কোনোভাবেই কোনো প্রকার অপূর্ণতা নেই, না সম্ভাব্য কোনো অপূর্ণতা না অব্যক্ত কোনো অপূর্ণতা।

এর উদাহরণ (الحي- আল হাইউ) 'চিরঞ্জীব' আল্লাহর নামসমূহের একটি নাম, যা এমন পূর্ণাঙ্গ জীবনকে নির্দেশ করে যা অস্তিত্বহীনতার পর্ব পেরিয়ে আসেনি এবং যাকে কখনো অস্তিত্বহীনতা স্পর্শ করবে না। যে জীবন সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর ধারক, যেমন: জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উদাহরণ: (العليم-আল আলীমু) 'সর্বজ্ঞ' আল্লাহর নামসমূহের একটি, যা পরিপূর্ণ জ্ঞানকে নির্দেশ করে, যে জ্ঞান কোনো অজ্ঞতার পর্ব পেরিয়ে আসেনি এবং যে জ্ঞানকে কোনো বিস্মৃতি স্পর্শ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قَالَ عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٖۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۝٥٢ ﴾ [طه: ٥٢]

মূসা বলল, 'এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না'। *[সূরা তাহা: ২০: ৫২]*

সুপরিব্যাপ্ত জ্ঞান যা সবদিক থেকে সকল কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, হোক তা আল্লাহ তা'আলার কর্মাদি বিষয়ক অথবা মাখলুকের কর্মাদি বিষয়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ۞وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ

ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩ ﴾ [الانعام: ٥٩]

আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোন দানা পড়ে না, না কোনো ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে। *[আল আনআম: ৫৯]*

﴿ ۞وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦ ﴾ [هود: ٦]

আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল[২]। সব কিছু আছে স্পষ্ট

[২] এখানে مستقر বা আবাসস্থল বলতে মাতৃগর্ভে অবস্থান মতান্তরে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়ায় অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর مستودع দ্বারা কবরস্থ করার স্থান মতান্তরে জন্মের পূর্বে পিতৃমেরুদন্ডে অবস্থান কিংবা মৃত্যুর সময় বা স্থান বুঝানো হয়েছে।

কিতাবে[3]। *[সূরা হূদ: ১১: ৬]*

﴿ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَيَعۡلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعۡلِنُونَۚ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ ﴾ [التغابن: ٤]

আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে বিষয়ে সম্যক অবগত। *[সূরা আত-তাগাবুন : ৬৪: ৪]*

তৃতীয় উদাহরণ: (الرحمن-আর রাহমানু) 'পরম করুণাময়' আল্লাহর নামসমূহের একটি যা পরিপূর্ণ রহমতকে শামিলকারী, যে রহমত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لله أرحم بعباده من هذه بولدها»

'এই নারী তার সন্তানের প্রতি যতটুকু করুণশীল আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি এর থেকেও অধিক করুণাশীল।'[৪] উক্ত হাদীসটি

---

৩ অর্থাৎ লওহে মাহফুযে।

৪ বর্ণনায় বুখারী, আদব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সন্তানের প্রতি করুণা, তাকে চুম্বন করা ও গলায় লাগানো। হাদীস নং (৫৯৯৯); মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপ্তি, হাদীস নং (২৭৫৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন। আর তা হলো, এক যুদ্ধ শেষে এক নারী তার শিশুকে যুদ্ধবন্দিদের ভেতরে পেল। সে তাকে তুলে নিল, পেটের সঙ্গে লাগাল এবং তাকে দুধ পান করাল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসটি ব্যক্ত করলেন। রহমান শব্দটি আল্লাহ তা'আলার ওই ব্যাপক দয়া-করুণাকেও শামিল করে আছে যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ﴾ [الاعراف: ١٥٦]

আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

(আল আরাফ: ৭: ১৫৬)

এই রহমতের ইঙ্গিত মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের প্রার্থনার মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা নিম্নবর্তী আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

﴿رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا﴾ [غافر: ٧]

হে আমাদের রব, আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী।

(গাফের: ৪০: ৭)

- আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিটি নাম আলাদা থাকা অবস্থায় যেমন পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে একটি নামকে অন্যটির সঙ্গে একত্র করার সময়ও পাওয়া যায়। আর একটি নামকে অন্যটির সঙ্গে একত্র করলে পরিপূর্ণতার পর আরও অধিক পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়।

এর উদাহরণ: (العزيز الحكيم আল আযীযুল হাকীম) ‘সর্বশক্তিমান অধিক প্রজ্ঞাময়’। আল্লাহ তা‘আলা আল কুরআনের বহু জায়গায় এ দুটি নামকে একত্র করে উল্লেখ করেছেন। এ অবস্থায় প্রতিটি নাম একদিকে তার নিজস্ব পূর্ণাঙ্গতাকে বুঝায়। যেমন ‘আল আযীয’ নামে ‘ইয্যত’ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ শক্তি এবং ‘আল হাকীম’ নামে পূর্ণাঙ্গ হিকমত ও প্রজ্ঞাকে বুঝায়। আর এ দুটিকে একত্র করলে অন্য আরেকটি পূর্ণাঙ্গ গুণকে বুঝায়। আর তা হলো আল্লাহ তা‘আলার শক্তি হিকমতপূর্ণ। ফলে আল্লাহ তা‘আলার শক্তি কোনো জুলুম-অন্যায় ও অপকর্মকে দাবি করে না, যেমনটি হতে পারে সৃষ্টিজীবের মধ্যে যারা শক্তিধর তাদের ক্ষেত্রে। কেননা সৃষ্টিজীবের মধ্যে যে শক্তিমান সে হয়ত গুনাহ গোপন রাখার জন্য তার শক্তিমত্তাকে ব্যবহারে উদ্রগ্রীব হয়ে ওঠতে পারে। ফলে সে জুলুম-অন্যায় ও অপকর্ম করতে শুরু করবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর বিচার ও হিকমত পূর্ণাঙ্গ শক্তিমিশ্রিত, সৃষ্টিজীবের বিচার ও হিকমতের বিপরীত; কেননা সৃষ্টিজীবের বিচার ও হিকমতে নিচুতা ও অজ্ঞতা মিশ্রিত হয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি: আল্লাহর নামসমূহ একই মুহূর্তে নাম ও গুণ

নাম এ হিসেবে যে তা আল্লাহ তা‘আলার সত্তাকে বুঝায়। এর পাশাপাশি

প্রতিটি নাম যে অর্থ ও ভাবকে নির্দেশ করে, তার নিরিখে প্রতিটি নাম গুণ হিসেবেও বিবেচিত। প্রথমোক্ত বিষয়টির বিবেচনায় যেহেতু প্রতিটি নাম অভিন্ন সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে নির্দেশ করছে অতএব তা সমার্থবোধক। আর দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টি বিবেচনায় যেহেতু প্রতিটি নাম সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক অতএব তা একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন। অতএব (الحي - চিরঞ্জীব, العليم - সর্বজ্ঞ, - القديرসর্বশক্তিমান, السميع- সর্বশ্রোতা, البصير - সর্বদ্রষ্টা, الرحمن - পরম করুণাময়, الرحيم - পরম দয়ালু, العزير - সর্বশক্তিমান, الحكيم - প্রজ্ঞাময়) সবগুলো একই সত্তার নাম। আর সে সত্তা হলেন আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু যেহেতু 'চিরঞ্জীব' এর অর্থ 'সর্বজ্ঞ' এর অর্থ থেকে ভিন্ন এবং 'সর্বজ্ঞ' এর 'সর্বশক্তিমান' এর অর্থ থেকে ভিন্ন। অন্যান্য নামের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য।

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ একই মুহূর্তে নাম ও গুণ এ কথার পক্ষে আল কুরআনে প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٧ ﴾ [يونس: ١٠٧]

আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু'। *(সূরা ইউনুস: ১০: ১০৭)*

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:

﴿ وَرَبُّكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحۡمَةِۖ ﴾ [الكهف: ٥٨]

আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। *(সূরা আল কাহাফ: ১৮: ৫৮)*

দ্বিতীয় আয়াতটি এ কথা বুঝাচ্ছে যে, ‘আররাহীম’ (পরম দয়ালু) হলেন তিনি যিনি দয়ার গুণে গুণান্বিত। আরবী ভাষাবিদদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে যে, যার জ্ঞান রয়েছে কেবল তাকেই জ্ঞানী বলা হবে, যার শ্রবনশক্তি রয়েছে কেবল তাকেই শ্রোতা বলা হবে, যার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে কেবল তাকেই দ্রষ্টা বলা হবে। এ কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট, এর পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আল্লাহর নামসমূহ থেকে তার অর্থগুলো যারা সরিয়ে দেয় এ আলোচনার দ্বারা তাদের বাতুলতা ও গোমরাহীর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা অর্জিত হলো। তাদের বক্তব্য হলো: আল্লাহ তা‘আলা শ্রবনশক্তি ছাড়াই সর্বশ্রোতা, দৃষ্টিশক্তি ছাড়াই সর্বদ্রষ্টা, শক্তি ছাড়াই তিনি শক্তিমান ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে যে যুক্তি পেশ করে তা হলো আল্লাহর জন্য গুণসমগ্র প্রমাণ করলে একই সত্তার জন্য বহুত্বকে প্রমাণিত করা হয়। এটি একটি খোঁড়া যুক্তি, তা বরং নিঃপ্রাণ মৃত যুক্তি; কেননা খোদ আল কুরআনই এ যুক্তিকে বাতিল করে দিয়েছে। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনাও এ যুক্তির বিপক্ষে।

আল কুরআন থেকে দলিল: যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বহুগুণে গুণান্বিত করে পেশ করেছেন এতএব আল্লাহ তা‘আলার

জন্য সিফাত বা গুণ যে প্রমাণিত তা নিঃসন্দেহ। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ إِنَّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيدُ ١٣ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ ١٤ ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ١٥ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٦ ﴾ [البروج: ١٢، ١٦]

নিশ্চয় তোমার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াময়। আরশের অধিপতি, মহান। তিনি তা-ই করেন যা চান । *(সূরা আল বুরুজ: ৮৫: ১২-১৬)*

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣ وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ ٥ ﴾ [الاعلى: ١، ٥]

তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর, যিনি সৃষ্টি করেন। অতঃপর সুসম করেন। আর যিনি নিরূপণ করেন অতঃপর পথ নির্দেশ দেন। আর

যিনি তৃণ-লতা বের করেন। তারপর তা কালো খড়-কুটায় পরিণত করেন। *(সূরা আল আলা: ১৯: ১-৫)*

উল্লিখিত আয়াতসমূহে অদ্বিতীয় সত্তার বহু গুণের কথা রয়েছে, কিন্তু গুণের বহুত্বের কারণে খোদ সত্তার বহুত্ব বহুত্বকে দাবি করে না।

যুক্তিবুদ্ধির দলিল: যেহেতু গুণগুলো গুণান্বিত থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়। গুণগুলো বিচ্ছিন্ন সত্তা হলে গুণান্বিত সত্তার বহুত্ব হওয়া দাবি করত; তা বরং গুণধারী সত্তার গুণাবলি যা তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে কায়েম রয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং অস্তিত্বশীল এমন কোনো বিষয় নেই যা বহু গুণ-বিশিষ্ট নয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাও পরিষ্কার হলো যে 'আদ-দাহর' (কাল) আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আদ-দাহর হলো নামবাচক একটি জমাট শব্দ; যাতে এমন কোনো অর্থ নেই যার কারণে একে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। যেহেতু উক্ত শব্দটি কাল ও সময়ের নাম সে হিসেবে আল্লাহ তা'আলা আখিরাত অস্বিকারকারীদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنۡيَا نَمُوتُ وَنَحۡيَا وَمَا يُهۡلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُۚ ﴾ [الجاثية: ٢٤]

> আর তারা বলে, ‘দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।’ *(আল জাছিয়া: ৪৫: ২৪)*

এর দ্বারা তারা রাত ও দিনের অতিক্রমকে বুঝিয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন: আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, কারণ সে আদ্দাহার (কাল) কে গালি দেয়। অথচ আমিই কাল, আমার হাতেই সব কিছু, আমি রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই।’[৫]

এ হাদীসটি আদ-দাহার শব্দটিকে আল্লাহর নাম হিসেবে সাব্যস্ত করছে না; কেননা যারা কালকে গালি দেয়, তাদের উদ্দেশ্য মূলত কালের গর্ভে সংঘটিত ঘটনাসমগ্র। তারা আল্লাহ তা‘আলাকে উদ্দেশ্য করে না। অতএব ‘আমিই কাল’ এ কথাটির ব্যাখ্যা হাদীসের পরবর্তী অংশ থেকেই বুঝা যায় যেখানে বলা হয়েছে, ‘আমার হাতেই সব কিছু, আমি রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই’ অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাই কাল এবং কালের গর্ভে যা আছে

---

[৫] - বর্ণনায় বুখারী, তাফসীরুল কুরআন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আমাদের তো কালই ধ্বংস করে, হাদীস নয় ৪৮২৭); মুসলিম, অধ্যায় : শব্দ আদবের অংশ, অনুচ্ছেদ : কালকে গালি দেয়া নিষিদ্ধ, হাদীস নং (২২৪৬)

সবকিছুর স্রষ্টা। আর এটা তিনি সুষ্টভাবেই বলেছেন যে তিনি রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান, আর এ দুটোই হলো কাল। আর এটা সম্ভব নয় যে পরিবর্তনকারী ও পরিবর্তনগ্রহণকারী একই জিনিস হবে। এতএব উক্ত হাদীসে উল্লিখিত 'আদ-দাহার' শব্দটির দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কে বুঝায় না।

তৃতীয় মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ যদি এমন গুণের নির্দেশকারী হয় যা মাখলুককেও স্পর্শকারী, তবে তিনটি বিষয়কে শামিল করবে:

প্রথমত: ওই নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: নামটি যে গুণকে শামিল করে আছে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

তৃতীয়ত: উক্ত গুণের যে হুকুম ও দাবি রয়েছে তা প্রমাণিত হওয়া।

এ কারণেই ডাকাতরা যদি তাওবা করে তবে তাদের বেলায় শরীয়তের বিধিবদ্ধ শাস্তি 'হদ' মওকুফ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুজতাহিদ আলিমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং দলিল হিসেবে তারা নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٤ ﴾ [المائدة: ٣٤]

কিন্তু হ্যাঁ তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবা করে নেয়, তবে জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। *(আল মায়েদা: ৫: ৩৪)*

কেননা এ দুটি নাম (ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু) এর দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং হদ রহিত করে তাদের প্রতি করুণ করেছেন।

এর উদাহরণ: السميع 'সর্বশ্রোতা' এটি একদিকে 'আস-সামী'উ' নামটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে। অন্যটি তা السمع 'শ্রবণশক্তি' কে আল্লাহর গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করছে। এবং শ্রবণের যে হুকুম ও দাবি তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা গোপন কথা ও নিভৃতে পরিচালিত কথাও শোনেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَٱللَّهُ يَسۡمَعُ تَحَاوُرَكُمَآۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُۢ بَصِيرٌ ١ ﴾ [المجادلة: ١]

আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(আল মুজাদালা: ১)*

আর যদি আল্লাহর নাম এমন গুণকে নির্দেশকারী হয় যা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় সীমিত থাকে, তবে তা দুটি বিষয়কে শামিল করে:

প্রথমত: ওই নামটি আল্লাহর জন্য প্রমাণিত হওয়া।

দ্বিতীয়ত: ওই নামটি যে গুণকে ধারণ করে আছে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া।

এর উদাহরণ: الحي 'চিরঞ্জীব' এটি একদিকে 'আল হাইউ' শব্দটিকে আল্লাহর নাম হিসেবে সাব্যস্ত করছে। অন্যদিকে 'আল হায়াত' তথা 'জীবন'- কে আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ হিসেবে সাব্যস্ত করছে।

চতুর্থ মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ তাঁর সত্তা ও গুণাবলির উপর (তিনভাবে প্রমাণবহ) সর্বদিক থেকে প্রমাণ করে, অন্তর্ভুক্তি হিসেবে প্রমাণ করে এবং দাবি হিসেবেও প্রমাণ করে:

এর উদাহরণ: الخالق 'স্রষ্টা' নামটি আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং সৃষ্টি করার গুণকে সরাসরি বুঝাচ্ছে। আর শুধু আল্লাহর সত্তা এবং শুধু সৃষ্টি করার গুণ (এ দুয়ের যে কোনো একটি)কে অন্তর্ভুক্তি হিসেবে বুঝায়। অর্থাৎ খালিক শব্দটি দুটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে আছে। একটি আল্লাহর নাম, অপরটি আল্লাহর গুণ। অতএব যেকোনো একটিকে অন্তর্ভুক্তি হিসেবে

বুঝায়। এর পাশাপাশি খালিক শব্দটি দাবি হিসেবে ‘ইলম’ ও ‘কুদরত’ এ দুটি গুণকে সাব্যস্ত করছে।

এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা যখন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন:

﴿لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا ١٢﴾ [الطلاق: ١٢]

> যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞানতো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে। *(সূরা আত্-তালাক:১২)*

শব্দের দাবিগত অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শরীয়তের জ্ঞান অন্বেষণকারীদের জন্য খুবই উপকারী। তারা যদি শব্দের অর্থ উদ্ধারে মনোনিবেশ করে এবং দাবিগত অর্থ কিভাবে উদ্ধার করতে হয় তা বুঝার জন্য আল্লাহ তা‘আলা তাওফীক দান করেন তবে একটি মাত্র দলিল থেকে বহু মাসআলা বের করতে তারা সক্ষম হবে।

জেনে রাখা ভালো যে, আল্লাহ তা‘আলার কথা এবং আল্লাহর রাসূলের কথার দাবিগত অর্থ, যদি তা শুদ্ধ দাবিগত অর্থ হয়, তবে তা হক ও সত্য। কেননা আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূলের কথা হক, অতএব যা হকের

দাবি তাও হক। উপরন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার যে দাবিগত অর্থ হতে পারে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সুপরিজ্ঞাত। অতএব তা উদ্দিষ্ট।

আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথা ব্যতীত অন্য কারো কথার দাবিগত অর্থের অবস্থা তিনটি:

প্রথমত: বক্তাকে বলা হবে যে আপনার কথার দাবিগত অর্থ হলো এই এবং বক্তাও তা মেনে নেবে। উদাহরণত যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণসমূহ অস্বীকার করে সে যদি এ প্রকৃতির গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্তকারীকে উদ্দেশ্য করে বলে: আপনি যে আল্লাহ তা'আলার কর্মগত গুণ সাব্যস্ত করছেন এর দাবি হলো যে আল্লাহ তা'আলার কিছু কর্ম অনাদি নয় বরং তা নতুন। এর উত্তরে কর্মগত গুণ সাব্যস্তকারী বলবে: হ্যাঁ, আমি এ বিষয়টি স্বীকার করি; কারণ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। তাঁর কথা ও কর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩ ﴾ [الكهف: ١٠٩]

বল, 'আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের

কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদিও এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি'। *(সূরা আল কাহাফ: ১৮: ১০৯)*

অন্যত্র তিনি বলেছেন:

﴿ وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٧ ﴾ [لقمان: ٢٧]

আর জমিনে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কালি), তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা লুকমান: ৩১: ২৭)*

অতএব বিশেষ বিশেষ নব কর্ম যদি আল্লাহ তা'আলা সম্পাদনা করেন তবে এর দ্বারা তাঁর কোনো ত্রুটি প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় অবস্থা: বক্তাকে তার কথার দাবিগত অর্থের কথা বলা হবে, কিন্তু সে এ দাবিগত অর্থ অস্বীকার করবে। যেমন আল্লাহর গুণসমূহ অস্বীকারকারী গুণসমূহ সাব্যস্তকারীকে লক্ষ্য করে বলবে: আপনি যে

আল্লাহর গুণসমূহ সাব্যস্ত করছেন এর দাবি হলো - আল্লাহ তা'আলা তার গুণসমূহের ক্ষেত্রে মাখলুক সদৃশ। এর উত্তরে গুণসমূহ সাব্যস্তকারী বলবে: না, দাবিগতভাবে তা প্রমাণিত হয় না। কেননা সৃষ্টিকর্তার গুণসমূহ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে উল্লিখিত। সম্পৃক্তি ছাড়া সাধারণভাবে তা উল্লেখ করা হয়নি। সাধারণভাবে উল্লেখ করলে আপনার কথা মেনে নিতাম। অতএব আল্লাহর গুণসমূহ কেবল আল্লাহর জন্যই তাঁর শান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট। উপরন্তু আমি আপনাকে বলব যে আপনি আল্লাহর গুণসমূহ অস্বীকার করা সত্ত্বেও তিনি যে একজন 'সত্তা' তা মেনে নেন, অর্থাৎ তাঁর জন্য যাত্ তথা সত্তা হওয়াকে সাব্যস্ত করেন এবং বলেন যে আল্লাহর সত্তা কোনো মাখলুকের সত্তা সদৃশ নয়। তাহলে যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুণের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ কি?

উল্লিখিত দুই অবস্থায় দাবিগত অর্থের বিষয়টি পরিষ্কার।

তৃতীয় অবস্থা: দাবিগত অর্থের ব্যাপারটি অব্যক্তভাবে আছে। কথাতে সেটার স্বীকারও নেই, আবার অস্বীকারও নেই। এ অবস্থার হুকুম হলো - দাবিগত অর্থটি বক্তার কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে না; কেননা এ ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, যদি বক্তার সম্মুখে তা উল্লেখ করা হয়, তবে সে তা মেনে নেবে অথবা দাবীগত অর্থটি অস্বীকার করবে। এক্ষেত্রে এটারও সম্ভাবনা রয়েছে যে যদি তার সম্মুখে দাবিগত অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়,

তখন সে দাবীগত অর্থটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং সেটার অসারতা বুঝতে পেরে তার কথা থেকে ফিরে আসবে। কারণ, যে অর্থ দাঁড়ালে সমস্যা অবধারিত হয় সে অর্থটি অগ্রহণযোগ্য হওয়াটি অবধারিত।

এ দুটি সম্ভাবনা থাকার কারণে বলা যাবে না যে, কোনো কথার দাবিগত ভাবও কথা হিসেবে ধর্তব্য।

যদি প্রশ্ন করে বলা হয় যে, যদি বক্তার কথার দাবি থেকে বিষয়টি ওঠে আসে, তবে এটিও বক্তার কথা হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। কারণ এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক; বিশেষ করে কথা ও তার দাবির মধ্যে যদি কাছাকাছি সম্পর্ক থাকে।

উত্তরে বলব: এ প্রশ্নটি এ হিসেবে অবান্তর যে, মানুষ তো মানুষই। মানুষের অন্তর্গত ও বহির্গত নানা অবস্থা রয়েছে, যার কারণে তার কথার দাবিগত অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে তা হয়ত তার অন্তর থেকে হারিয়ে যায়, সে হয়ত উদাসীন হয়ে পড়ে, অথবা ভুল করে, অথবা সে দিশেহারা হয়ে পড়ে, অথবা সে তর্কের চাপে দাবিগত অর্থে চিন্তা করা ব্যতীতই কোনো কথা বলে ফেলে ইত্যাদি।

পঞ্চম নীতিমালা: আল্লাহর নামসমূহ কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর, এ ক্ষেত্রে

মানুষের বুদ্ধিবিবেচনার কোনো দখল নেই।

অতএব কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর নামসমূহের ব্যাপারে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এর ওপর কোনো কিছু বাড়ানোও যাবে না, কমানও যাবে না; কেননা আল্লাহ তা‘আলা যা কিছুর উপযোগী মানুষের আকল-বুদ্ধি দ্বারা তা আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। অতএব কুরআন-সুন্নাহর টেক্সট তথা ভাষ্যের সীমানায় আমাদের সীমিত হয়ে যেতে হবে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولٗا ٣٦ ﴾ [الاسراء: ٣٦]

যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না; নিশ্চিত কর্ন, চক্ষু, হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *[আল ইসরা: ১৭: ৩৬]*

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنٗا وَأَن

تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٣ ﴾ [الاعراف: ٣٣]

বল, ‘আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না’। *(আল আরাফ: ৭: ৩৩)*

উপরন্তু আল্লাহ তা‘আলার ওপর এমন নাম আরোপ করা যা তিনি নিজেকে দেননি, অথবা তিনি নিজেকে যে নাম দিয়েছেন তা অস্বীকার করা আল্লাহর বিরুদ্ধে স্পর্ধা প্রদর্শন বই অন্যকিছু নয়। অতএব এ ব্যাপারে আদব রক্ষা করতে হবে এবং কুরআন-সুন্নাহর পাঠে যা কিছু আছে সেখানেই সীমিত হয়ে যেতে হবে।

ষষ্ঠ নীতিমালা: আল্লাহর নামসমূহ সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসিদ্ধ একটি হাদীসে বলেছেন:

«أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك»

'হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রত্যেক ওই নাম দ্বারা প্রার্থনা করছি যা আপনার, যে নাম আপনি নিজেকে দিয়েছেন, অথবা আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা আপনি আপনার সৃষ্টিজীবের কাউকে শিখিয়েছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কাছে, আপনার গায়েবী ইলমে একান্তভাবে রেখে দিয়েছেন।' হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইবনে হিববান এবং ইমাম হাকেম বর্ণনা করেছেন আর হাদীসটি সহীহ।[৬]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে আল্লাহ তা'আলা তার গায়েবী ইলমে যা একান্তভাবে রেখে দিয়েছেন তা কারও পক্ষেই হিসেব করে দেখা অথবা তা আয়ত্বে আনা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

আর যে হাদীসটিতে আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নামের কথা এসেছে

[৬] - বর্ণনায় আহমদ (১/৩৯১, ৪৫২); ইবনে হিববান হাদীস নং (২৩৭২); হাকেম (১/৫০৯), আলবানী এটিকে ' আল আহাদীসুস্সাহীহা'- তে উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة»

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি, একটি বাদে একশটি, এমন নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা ইহসা[৭] (তথা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত) করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৮] এ হাদীসটি নিরানববই সংখ্যায় আল্লাহর নাম সীমিত হওয়াকে বুঝাচ্ছে না। যদি সীমিত হওয়া বুঝাত তবে হাদীসের ভাষ্য এমন হত: 'নিশ্চয় আল্লাহর নাম নিরানব্বইটি, যে তা ইহসা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' অথবা এ জাতীয় কোনো ভাষ্য।

তাহলে হাদীসের অর্থ হলো: এ সংখ্যার বাস্তবতা, যে ব্যক্তি এই সংখ্যায় আল্লাহর নামগুলোর বাস্তব অর্থ কাজে লাগাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা 'যে ব্যক্তি তা

---

[৭] - নামগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর অর্থ এ নামগুলোর শব্দমালা মুখস্ত করা, তার অর্থ বোঝা এবং তার দাবি অনুযায়ী আমল করা (লেখক)

[৮] - বর্ণনায় বুখারী, তাওহদী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার একটি কম একশটি নাম রয়েছে, হাদীস নং (৭৩৯২); মুসলিম, যিকির অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : আল্লাহর নাম এবং যে তা গুণবে তার মর্যাদা, (২৬৭৭)।

ইহসা (যথার্থভাবে কার্যে পরিণত) করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে’ এর পূর্ববর্তী বাক্যের পরিপূরক বাক্য। এটি কোনো স্বনির্ভর আলাদা বাক্য নয়। এর উদাহরণ হলো আপনি যদি বলেন: আমার কাছে একশ’ টাকা আছে যা আমি দান করার জন্য গণনা করে রেখেছি, তাহলে এ কথার অর্থ এটা নয় যে আপনার কাছে এ ছাড়া অন্য কোনো টাকা নেই। বরং এর অর্থ হলো আপনার কাছে আরো টাকা আছে, তবে দান করার জন্য একশ’ টাকা গণনা করে রেখেছেন।

এ নামগুলো কোন্ কোন্ নাম তা নির্ণয় করে সহীহ কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে নাম নির্দিষ্ট করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীসটি এসেছে তা দুর্বল।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. ‘আল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে বলেন,‘এই নামগুলো সুনির্দিষ্ট করণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কোনো বাণী উল্লিখিত হয়নি। এ ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞদের ঐক্যমত্য রয়েছে।[৯] ইমাম ইবনে তাইমিয়া এর পূর্বে বলেছেন, (নিরানব্বইটি নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে) তা আল ওয়ালীদ নামক এক বর্ণনাকারী তার শামদেশীয় একজন শায়খের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার তার গ্রন্থ

[৯] - মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৮৩

'ফাতহুল বারী'- তে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ওয়ালীদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে পরিত্যাগ করেছেন। এ পরিত্যাগ করার কারণ শুধু এটা নয় যে, এ হাদীসটি ওয়ালীদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন, বরং হাদীসটিতে মতদ্বৈততা ও অসঙ্গতি রয়েছে, হাদীসটিতে তাদলীস ও অন্য কারও বক্তব্য তাতে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।'[১০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনির্দিষ্ট কোনো হাদীসে যেহেতু এ নিরানব্বইটি নাম উল্লেখ করেননি, তাই সালাফদের মধ্যে এ নামগুলো সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের থেকে নানামুখী বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। যাই হোক, আমি কুরআন হাদীস ঘেঁটে আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম এখানে একত্র করেছি। নামগুলো আমি দু'ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগ হলো কুরআন থেকে এবং দ্বিতীয় ভাগ হলো সুন্নাহ থেকে।

প্রথমত: কুরআন থেকে:

الإله	الأكرم	الأعلى	الأحد
উপাস্য	অনেক সম্মানিত	অনেক উপরে	একক

[১০] - ইবনে হাজার আল আসকালানী, ফাতহুল বারী, খন্ড১১, পৃ. ২১৫

الباري সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী	الباطن সর্বনিকটে অপ্রকাশিত	الظاهر সবার উপরে, প্রকাশিত	الآخر সর্বশেষ
الحافظ রক্ষাকারী	الجبار দুর্নিবার	التواب তাওবা কবুলকারী	البصير সর্ববিষয় দর্শনকারী
المبين সুস্পষ্ট	الحق পরম সত্য	الحفي পুরোপরি অবহিত	الحفيظ সংরক্ষণকারী
القيوم সবকিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী	الحي চিরঞ্জীব	الحميد সকল প্রশংসার অধিকারী	الحليم অত্যন্ত ধৈর্যশীল

الرحمن পরম দয়ালু	الرءوف পরম স্নেহশীল	الخلاق সর্বস্রষ্টা	الخالق সৃষ্টিকর্তা
السميع সর্বশ্রোতা	السلام শান্তি দানকারী	الرقيب তত্বাধায়ক	الرزاق রিযকদাতা
العالم জ্ঞানী	الصمد সর্ববিষয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত	الشهيد সর্বজ্ঞ সাক্ষী	الشكور গুণগ্রাহী
الغفار পরম ক্ষমাশীল	العلي উচ্চ মর্যাদাশীল	العليم সর্বজ্ঞ	العظيم সর্বোচ্চ-মর্যাদাশীল
القاهر	القادر	الفتاح	الغني

পরাক্রমশালী	মহা ক্ষমতাবান	বিজয় দানকারী	অমুখাপেক্ষী
القهار কঠোর	القوى পরম শক্তির অধিকারী	القريب অতি নিকবর্তী	القدير প্রবল ক্ষমতাধর
المتعالي সৃষ্টির গুনাবলীর উর্দ্ধে	المؤمن নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী	اللطيف সুক্ষ্মদর্শী, কৌশলী	الكريم সুমহান দাতা
المحي জীবন দানকারী	المجيد মর্যাদার অধিকার	المجيب জবাব দানকারী	المتين সুদৃঢ়
المليك মালিক	الملك সর্বকর্তৃত্বময়	المقيت জীবনোপকরণ দানকারী	المقتدر নিরঙ্কশ সিদ্বান্তের অধিকারী

الوارث উত্তরাধিকারী	الواحد এক ও অদ্বিতীয়	সাহায্যকারীالنصير	المهيمن রক্ষণাবেক্ষণকারী
মহাদাতাالوهاب	الولي অবিভাবক	الوكيل কর্ম সম্পাদনকারী	الودود সদয়

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে:

الرفيق দয়াবান	الرب প্রভূ	الحي চিরঞ্জীব	الحكم **মহাবিচারক**	
الباسط **প্রশস্তকারী**	القابض **সংকীর্ণকারী**	الطيب উত্তম, পবিত্র	الشافي **আরোগ্যদান কারী**	

বেজোড়, الوتر **একক**	المنان দানশীল	المعطي **মহাদাতা**	المحسن **অনুগ্রহকারী**

এ নামগুলো যথার্থভাবে ঘেঁটে নির্বাচন করেছি। কুরআনে কারীম থেকে ৮১টি আর সুন্নাতে রাসূল থেকে বাকী ১৮টি গ্রহণ করেছি। যদিও আমি ‘আল-হাফীয়্য’ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত। কারণ এ নামটি এককভাবে আসেনি, বরং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে শর্তযুক্ত ভাবে এসেছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ সম্পর্কে বলেছেন,

﴿إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا ٤٧﴾ [مريم: ٤٧]

“নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল”। [সূরা মারইয়াম: ৪৭] অনুরূপভাবে ‘আল-মুহসিন’ নামটিও। কারণ তাবারানীতে বর্ণিত এ নামটির বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারি নি। তবে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এটিকে আল্লাহর নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া আল্লাহর নামসমূহের কিছু রয়েছে অন্য শব্দের সাথে সন্ধন্ধযুক্ত হয়ে। যেমন, ‘মালিকাল মুলকি’ ‘যিল-জালালি ওয়াল ইকরামি’।

সপ্তম মূলনীতি: আল্লাহর নামগুলো সংক্রান্ত ইলহাদ (অস্বীকার করা) হলো, এ নামসমূহের ব্যাপারে যে অবস্থান গ্রহণ আবশ্যক তা না করে তাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করা।

আর তা কয়েক প্রকার:

প্রথমত: আল্লাহর নামসমূহের কোনো কিছু অস্বীকার করা অথবা নামসমূহ যেসব সিফাত (গুণ) ও হুকুম-আহকাম শামিল করে আছে তার মধ্যে কোনো বিষয় অস্বীকার করা। যেমনটি করেছে জাহমিয়া সম্প্রদায় ও অন্যান্য আহলে তা'তীল তথা আল্লাহর গুণসমূহ অকার্যকর বলে ধারণাকারী সম্প্রদায়। এটা এ জন্য ইলহাদ (অস্বীকার) যে, আল্লাহর নামসমূহ ও তা যেসব হুকুম-আহকাম এবং আল্লাহর জন্য উপযুক্ত গুণসমূহকে শামিল করছে তার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। অতএব এ সবের মধ্যে কোনো কিছু অস্বীকার করার অর্থ, যা ওয়াজিব তা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য দিকে ঝুঁকে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর নামসমূহ এমন গুণ-নির্দেশক করে দেওয়া যা সৃষ্টিজীবের গুণ সদৃশ। যেমনটি করেছে আহলে তাশবীহ তথা আল্লাহর গুণসমূহকে সৃষ্টিজীবের গুণসদৃশকারী সম্প্রদায়। এটা এ কারণে যে,

অর্থগতভাবে তাশবীহ (সাদৃশ্যকরণ) একটি বাতিল বিষয়। কুরআন-সুন্নাহর কোনো ভাষ্য এ বিষয়টিকে নির্দেশ করতে পারে না, বরং কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্যসমূহ এ বিষয়টিকে বাতিল হওয়ার উপর প্রমাণবহ। অতএব আল্লাহর গুণসমূহকে সৃষ্টিকুলের গুণের সাথে তাশবীহ তথা সাদৃশ্যবোধক করে দেওয়ার অর্থ আল্লাহর নামের ব্যাপারে যা ওয়াজিব ও যথার্থ তা থেকে বিচ্যুতি।

তৃতীয়ত: আল্লাহ তা'আলার ওপর এমন নাম প্রয়োগ করা যা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের ওপর প্রয়োগ করেননি। যেমন খৃষ্টান সম্প্রদায় আল্লাহর ওপর (পিতা) নাম প্রয়োগ করেছে। আর দার্শনিকরা তাঁর ওপর প্রয়োগ করেছে (কার্যকরী কারণ) নাম। এটা এ জন্য বিচ্যুতি যে, আল্লাহর নামসমূহ ওহীনির্ভর। অতএব আল্লাহ তা'আলার ওপর এমন নাম প্রয়োগ করা যা তিনি নিজের ওপর প্রয়োগ করেননি, নামের ব্যাপারে যা ওয়াজিব ও যথার্থ তা থেকে বিচ্যুতি। তা ছাড়া এ প্রয়োগকৃত নামগুলো স্বয়ং বাতুলতাপূর্ণ; যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

চতুর্থত: আল্লাহর নামসমূহ থেকে উৎকলিত করে কোনো উপাস্য বস্তুর নাম রাখা। যেমন -এক বর্ণনা মতে - মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার 'আল আযীয' নাম থেকে উৎকলিত করে তাদের মূর্তি আল উয্যার নাম রেখেছে। আল্লাহ তা'আলার 'ইলাহ' নাম থেকে উৎকলিত করে তাদের মূর্তি 'লাত'

এর নাম রেখেছে। অতএব তারা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ থেকে উৎকলিত করে তাদের উপাস্যসমূহের নাম রেখেছে। এটা এ কারণে ইলহাদ যে, আল্লাহর নামসমূহ কেবল তাঁর জন্যই সুনির্দিষ্ট। এর দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক। *(সূরা আল আরাফ:১৮০)*

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ٨ ﴾ [طه: ٨]

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। *(সূরা তাহা: ২০: ৮)*

আরও ইরশাদ হয়েছে:

﴿لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ﴾ [الحشر: ٢٤]

তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও জমিনে যা

আছে সবই তাঁর। *(সূরা আল হাশর: ৫৯: ২৪)*

অতএব, যেভাবে ইবাদত ও সত্য উলুহিয়ত আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট এবং আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা বর্ণিত, অনুরূপভাবে সুন্দরতম নামসমূহ তাঁর জন্যই সুনির্ধারিত। সুতরাং এ নামগুলো যেভাবে আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয় সেভাবে এগুলোর দ্বারা অন্য কারও নাম রাখা, নাম বিষয়ে যা ওয়াজিব ও উচিত তা থেকে বিচ্যুতি।

আল্লহর নামসমূহের সব ধরনের বিকৃতিই হারাম: কেননা আল্লাহ তা'আলা বিকৃতিসাধনকারীদের হুঁশিয়ার করে বলেছেন:

﴿وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٨٠﴾ [الاعراف: ١٨٠]

আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে। *(সূরা আল আরাফ: ৭: ১৮০)*

এ বিকৃতিকরণের মধ্যে শরীয়তের দলিলের নিরিখে কোনোটি শেরেকী আবার কোনোটি কুফরী।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহ তা‘আলার সিফাত তথা গুণ-বিষয়ক মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ তা‘আলার সকল সিফাতই পূর্ণাঙ্গ এবং এতে কোনো প্রকার অপূর্ণতা নেই।

যেমন হায়ত (জীবন), ইলম, (জ্ঞান), কুদরত, (ক্ষমতা) শ্রবণ, দর্শন, রহমত, ইয্যত (পরাক্রমশালিতা), হিকমত (প্রজ্ঞা), সর্বোচ্চে থাকা, আযমত (মহত্ব) ইত্যাদি। এর পক্ষে দলিল হলো ওহী, আকল (বুদ্ধিগত যুক্তি) ও ফিতরাত (স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি)।

ওহী থেকে দলিল: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوۡءِۖ وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٦٠ ﴾ [النحل: ٦٠]

যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না, তাদের জন্য মন্দ উদাহরণ এবং আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ উদাহরণ। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ৬০)*

‘সর্বোচ্চ উদাহরণ’ অর্থ হলো সর্বোচ্চ গুণ।

বুদ্ধিগত দলিল হলো: বাস্তবে অস্তিত্ববান প্রতিটি বস্তুরই অবশ্যই কিছু গুণবৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ গুণবৈশিষ্ট্য হয়ত পূর্ণাঙ্গ হবে, অথবা অপূর্ণাঙ্গ। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ গুণ রব তা‘আলার ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য, বরং তা বাতিল। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা মূর্তিসমূহের ইলাহ হওয়ার বাতুলতা এভাবে প্রকাশ করেছেন যে তা অপূর্ণাঙ্গতা ও অক্ষমতার বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥ ﴾ [الاحقاف: ٥]

তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের আহবান সম্পর্কে উদাসীন। *(সূরা আল আহকাফ: ৪৬: ৫)*

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ٢٠ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٢١ ﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]

আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। (তারা) মৃত, জীবিত নয় এবং তারা জানে না কখন তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে। *(সূরা আন্ নাহল: ১৬: ২০-২১)*

আর ইব্রাহীম আ. তাঁর পিতার বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে যা বলেছেন তার বর্ণনায় আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـٔٗا ٤٢﴾ [مريم: ٤٢]

হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে? *(সূরা মারয়াম: ১৯: ৪২)*

ইব্রাহীম আ. তাঁর কাওমের বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে যা বলেছেন তা উল্লেখপূর্বক ইরশাদ হয়েছে:

﴿ قَالَ أَفَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يَضُرُّكُمۡ ٦٦ أُفّٖ لَّكُمۡ وَلِمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٦٧ ﴾ [الانبياء: ٦٦، ٦٧]

> সে বলল, ‘তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত কর, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না’? ‘ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদেরকে! ‘তবুও কি তোমরা বুঝবে না’? *(সূরা আল আম্বিয়া: ২১: ৬৬ -৬৭)*

উপরন্তু অনুভূতি ও দৃষ্টির অভিজ্ঞতা থেকে এটা প্রমাণিত যে সৃষ্টিজীবেরও কিছু পূর্ণাঙ্গ গুণ রয়েছে, আর তা আল্লাহ তা‘আলারই দেওয়া। অতএব যিনি পূর্ণাঙ্গ বিষয় দিতে পারেন তিনি তো পূর্ণাঙ্গতার ব্যাপারে অধিক হকদার।

স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি তথা ফিতরতগত দলিল হলো: মানব অন্তরসমূহ মূলত এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তা আল্লাহ তা‘আলাকে মহববত করবে, তাঁকে তা‘যীম ও ইবাদত করবে। স্বচ্ছ অন্তরের অধিকারী প্রতিটি মানুষের এটাই হলো প্রত্যাশা। আর এরূপ অন্তর কেবল ওই সত্তাকেই মহব্বত, তা‘যীম ও ইবাদত করতে পারে যার ব্যাপারে জানা আছে যে তিনি তাঁর রুবুবিয়ত ও উলুহিয়তের উপযুক্ত পূর্ণাঙ্গ গুণ মাধুরিতে গুণান্বিত।

যদি কোনো গুণ এমন থাকে যা অসম্পূর্ণ তবে তা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে না। যেমন মৃত্যু, অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, অক্ষমতা, অন্ধত্ব, বধিরত্ব ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٧]

আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মরবেন না। *(সূরা আল ফুরকান: ২৫: ৫৮)*

মূসা আ. এর কথা উল্লেখ করে আল কুরআনে এসেছে:

﴿ عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٖۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۝٥٢ ﴾ [طه: ٥٢]

এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। *(সূরা তাহা: ২০: ৫২)*

অক্ষমতা আল্লাহ তা'আলাকে স্পর্শ করতে পারে না, এ ব্যাপারে আল কুরআনে এসেছে:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزَهُۥ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمٗا قَدِيرٗا ۝٤٤ ﴾ [فاطر: ٤٤]

আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও জমিনের কোনো কিছু তাঁকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। *(সূরা ফাতির: ৩৫: ৪৪)*

আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, এ বিষয়টি তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ أَمۡ يَحۡسَبُونَ أَنَّا لَا نَسۡمَعُ سِرَّهُمۡ وَنَجۡوَىٰهُمۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيۡهِمۡ يَكۡتُبُونَ ٨٠ ﴾ [الزخرف: ٨٠]

না কি তারা মনে করে, আমি তাদের গোপনীয় বিষয় ও নিভৃত সলাপরামর্শ শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ, আর আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকে লিখছে। *(আয্যুখরুফ: ৪৩: ৮০)*

হাদীসে দাজ্জাল সম্পর্কে এসেছে:

«إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»

'নিশ্চয় সে কানা, আর তোমাদের রব কানা নন।'

অন্য এক হাদীসে এসেছে:

«أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم، ولا غائباً»

হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর প্রশান্ত থেকে তাকে ডাকো; কারণ তোমরা এমন কাউকে ডাকছ না যিনি বধির ও অনুপস্থিত।'

আর যারা আল্লাহ তা'আলাকে অপূর্ণাঙ্গ গুণে গুণান্বিত বলে আখ্যায়িত

করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ ﴾ [المائدة: ٦٤]

আর ইয়াহূদীরা বলে: আল্লাহর হাত বাঁধা, তাদের হাতই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে তার জন্য তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছে বরং তাঁর দু' হাত প্রসারিত, তিনি যেভাবে ইচ্ছা খরচ করেন'। *(সূরা আল-মায়েদা: ৫: ৬৪)*

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ لَّقَدۡ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٞ وَنَحۡنُ أَغۡنِيَآءُۘ سَنَكۡتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ١٨١ ﴾ [ال عمران: ١٨١]

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী'। অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা বলেছে এবং নবীদেরকে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও এবং আমি বলব,

‘তোমরা উত্তপ্ত আযাব আস্বাদন কর’। *(সূরা আল ইমরান: ৩: ১৮১)*

তারা আল্লাহ তা‘আলার ওপর যেসব অপূর্ণাঙ্গ গুণ আরোপ করে তা থেকে যে তিনি পবিত্র এ বিষয়টি ঘোষণা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝١٨٠ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ ۝١٨١ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝١٨٢ ﴾ [الصافات: ١٨٠، ١٨٢]

‘তারা যা ব্যক্ত করে তোমার রব তা থেকে পবিত্র মহান, সম্মানের মালিক। আর রাসূলদের প্রতি সালাম। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য।’ *(সূরা আস-সাফফাত: ৩৭: ১৮০ -১৮২)*

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝٩١ ﴾ [المؤمنون: ٩١]

আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ

> নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র! *(সূরা আল মুমিনূন:৯১)*

আর যদি গুণটি এমন হয় যা এক অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ এবং অন্য অবস্থায় অপূর্ণাঙ্গ, তবে তা উন্মুক্তভাবে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা বৈধও নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়। বরং এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা রয়েছে। অর্থাৎ যে অবস্থায় গুণটি পূর্ণাঙ্গ সে অবস্থায় তা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে। আর যে অবস্থায় তা অপূর্ণাঙ্গ সে অবস্থায় তা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যেমন ষড়যন্ত্র, কৌশল অবলম্বন, ধোঁকা ইত্যাদি। এসব গুণ ওই অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত হবে যে অবস্থায় তা এমন কারো বিরুদ্ধে করা হবে যে অনুরূপ কর্ম করতে সক্ষম; কেননা তা সে অবস্থায় এটা বোঝাবে যে এ কর্মের কর্তা অভিন্ন ধরনের কর্ম অথবা তার থেকেও শক্তিশালী কর্ম দিয়ে তার শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম। এ অবস্থার বিপরীত হলে এ গুণগুলো অপূর্ণাঙ্গ গুণ বলে বিবেচিত হবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তা এমন লোকদের মোকাবিলায় উল্লেখ করেছেন যারা তার সঙ্গে এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে একই আচরণ করে। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُۖ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلۡمَٰكِرِينَ ۝٣٠﴾ [الانفال: ٣٠]

‘আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম কৌশলী। *(সূরা আল আনফাল: ৮: ৩০)*

তিনি আরো বলেছেন:

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝١٥ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝١٦ ﴾[الطارق: ١٥، ١٦]

‘নিশ্চয় তারা ভীষণ কৌশল করছে। আর আমিও ভীষণ কৌশল করছি।’ (সূরা আত তারিক: ৮৬: ১৫-১৬)

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٨٢ وَأُمْلِي لَهُمْۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۝١٨٣ ﴾[الاعراف: ١٨٢، ١٨٣]

ইরশাদ হয়েছে:

আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পারবে না। আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি। নিশ্চয় আমার কৌশল শক্তিশালী। *(সূরা আল আরাফ: ৭: ১৮২-১৮৩)*

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ﴾ [النساء: ١٤٢]

নিশ্চয় মুনাফিকরা আললাহকে ধোঁকা দেয়। অথচ তিনি তাদের ধোঁকাদানকারী। *(সূরা আন নিসা: ৪: ১৪২)*

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ۝١٤ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ﴾ [البقرة: ١٤، ١٥]

আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন। *(সূরা আল বাকারা: ২: ১৪-১৫)*

এ কারণেই, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলাও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এ কথা বলা হয় নি। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدۡ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ فَأَمۡكَنَ مِنۡهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٧١ ﴾ [الانفال: ٧١]

> আর যদি তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা করে, তাহলে তারা তো পূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অতঃপর তিনি তাদের উপর (তোমাকে) শক্তিশালী করেছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান। *(সূরা আল আনফাল: ৮: ৭১)*

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে 'তিনি তাদের ওপর (তোমাকে) শক্তিশালী করেছেন', একথা বলেননি যে 'তিনিও তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন; কেননা বিশ্বাসঘাতকতা আমানতদারির মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়। আর এটা সর্বাবস্থায় খারাপ গুণ।

এ থেকে বুঝা গেল যে, কিছু সাধারণ লোকেরা যে বলে থাকে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন', এ কথাটি নিতান্তই জঘন্য। তা থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় মূলনীতি: সিফাতের অধ্যায় নামের অধ্যায় থেকে প্রশস্ততর।

কারণ প্রতিটি নামই একটি গুণকে শামিল করে আছে, যেমন আল্লাহর নাম-বিষয়ক মূলনীতির তৃতীয়টিতে উল্লিখিত হয়েছে। আর যেহেতু আল্লাহর সিফাত আল্লাহর কার্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর আল্লাহর কার্যাদির কোনো

সীমা পরিসীমা নেই, যেমন তার কথারও কোনো সীমা পরিসীমা নেই। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٧ ﴾ [لقمان: ٢٧]

‘আর জমিনে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কালি), তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা লুকমান: ৩১: ২৭)*

এর উদাহরণ: আল্লাহর গুণসমূহের মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:

الإتيان আগমণ করা, الأخذ পাকড়াও করা, الإمساكধরা, البطش পাকড়াও করা এবং এজাতীয় আরও অগণিত সিফাত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]

আর তোমার রব আসবেন... *(সূরা ফজর: ৮৯: ২২)*

﴿ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ ٱلۡغَمَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠]

'তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, মেঘের ছায়ায় আল্লাহ তাদের নিকট আগমন করবেন।' *(সূরা আল বাকারা: ২: ২১০)*

আল্লাহ বলেছেন:

﴿فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمۡۗ﴾ [ال عمران: ١١]

ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদরেকে পাকড়াও করেছেন। *(সূরা আলে ইমরান: ৩: ১১)*

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿يُمۡسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦٓۚ﴾ [الحج: ٦٥]

'আর তিনিই আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা জমিনের উপর পড়ে না যায়।' *(সূরা আল হাজ্জ: ২২: ৬৫)*

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ ﴾ [البروج: ١٢]

‘নিশ্চয় তোমার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন।’ *(সূরা আল বুরুজ: ৮৫: ১২)*

আবার ইরশাদ হয়েছে:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

আল্লাহ তোমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিতে চান এবং কঠিন চান না। *(সূরা আল বাকারা: ২: ১৮৫)*

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»

(আমাদের রব প্রতিদিনই নিম্নাকাশে নেমে আসেন।) [১১]

অতএব, আমরা আল্লাহর সঙ্গে এসব গুণ ঠিক সেভাবেই সম্পৃক্ত করব যেভাবে ওপরে বর্ণিত হলো। আর এগুলো দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নাম তৈরি করব না, বলব না যে আল্লাহর নাম হলো الجائي (আগন্তক), الآتي (আগন্তক), الآخذ (পাকড়াওকারী), الممسك (ধারক), الباطش (পাকড়াও কারী), المريد (ইচ্ছুক), النازل (অবতরণকারী) ইত্যাদি। যদিও আমরা

---

[১১] - বুখারী, হাদীস নং (১১৪৫), মুসলিম, হাদীস নং (৭৫৮)

এসব গুণ ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সংবাদ দিই এবং এসব গুণে আল্লাহ তা'আলাকে গুণান্বিত করি।

তৃতীয় মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। সাব্যস্তজাত গুণ ও অসাব্যস্তজাত গুণ।

সাব্যস্তজাত গুণ: যা আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে অথবা তার রাসূলের যবানে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর এসবই হলো পূর্ণাঙ্গ গুণ যাতে কোনো অপূর্ণাঙ্গতা নেই। যেমন জীবন, ইলম, কুদরত, আরশের ওপরে থাকা, নিম্নাকাশে অবতরণ, চেহারা, দু'হাত, ইত্যাদি।

এসব গুণ আল্লাহ তা'আলার জন্য তাঁর শান অনুযায়ী প্রকৃত অর্থে সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। এর দলিল হলো ওহী ও আকল।

ওহী থেকে দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ ﴾ [النساء: ١٣٦]

> হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কেউ কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে। *(সূরা আন্ নিসা: ৪: ১৩৬)*

আল্লাহর প্রতি ঈমান তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানকেও শামিল করে। আর রাসূলের প্রতি যে কিতাব নাযিল হয়েছে তাঁর প্রতি ঈমান, কিতাবে-থাকা আল্লাহর সকল গুণের প্রতিও ঈমান। আর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ওইসব সংবাদের প্রতি ঈমানকেও শামিল করে যা তিনি তাঁর প্রেরক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে দিয়েছেন।

মানব বিবেক-বুদ্ধির দলিল হলো, আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপারে এসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। আর তিনি নিজের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে ভালো জানেন। তিনি সর্বোচ্চ সত্যবাদী এবং তাঁর কথা সর্বোচ্চ সৌন্দর্যমন্ডিত। অতএব আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন বিনা দ্বিধায় তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা ওয়াজিব; কেননা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তো তখন আসে যখন

সংবাদটি এমন কোনো উৎস থেকে আসে যার ব্যাপারে অজ্ঞতা, মিথ্যা ও ভাব প্রকাশে অপারগতার ধারণা করা যেতে পারে। আর এ তিন প্রকার দোষের প্রতিটি থেকেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে যেসব সংবাদ দিয়েছেন সেসবের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের ব্যাপারে সকল মানুষের চেয়ে ভালো জানেন। তিনি এ ব্যাপারে সমধিক সত্যবাদী ও সুভাকাঙ্খী। আর ভাব প্রকাশে তিনি মানুষের মধ্যে সব থেকে অধিক পারঙ্গম। অতএব তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন তা গ্রহণ করা ওয়াজিব।

অসাব্যস্তজাত সিফাত: আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে যা অসাব্যস্ত করেছেন তা। আর এসবই হলো আল্লাহর জন্য অপূর্ণাঙ্গ গুণ। যেমন মৃত্যু, নিদ্রা, অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, অক্ষমতা এবং অবসাদ। অতএব এসব গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না করা ওয়াজিব। এর পাশাপাশি এসবের বিপরীত গুণগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য যা অসাব্যস্ত করেছেন তা এ জন্য অসাব্যস্ত করেছেন যে এসবের বিপরীতগুলো আল্লাহর জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে সাব্যস্ত। শুধু অসাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা অসাব্যস্ত করা কোনো পূর্ণাঙ্গতা নয়। তবে যদি

অসাব্যস্তকরণ পূর্ণাঙ্গতা শামিল করে তবে তার কথা ভিন্ন। এটা এ কারণে যে অসাব্যস্ত বিষয় হলো অস্তিত্বহীন বিষয়। আর অস্তিত্বহীন বিষয় কোনো বিষয়ই না। অতএব তা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর অসাব্যস্তকরণ কখনো কখনো পাত্রের অনুপযোগিতার কারণে হয়ে থাকে। অতএব এ অবস্থায়ও তা পূর্ণাঙ্গতাকে হারায়। উদাহরণত, যদি বলি দেওয়াল জুলুম করে না, তবে এ কথা শুদ্ধ হবে না; কারণ দেওয়ালের জুলুম করার কোনো ক্ষমতাই নাই।

আবার কখনো কখনো অপূর্ণাঙ্গতা হয় অক্ষমতার কারণে, ফলে তা অপূর্ণাঙ্গতা বিবেচিত হয়। যেমন কোনো কবি বলেন,

এ গোত্র কোনো যিম্মাদারীরই অন্যথা করতে পারে না,

তারা মানুষকে সরিষা পরিমাণও জুলুমের ক্ষমতা রাখে না

অন্য কবি বলেন,

কিন্তু আমার জাতি যদিও তারা অনেক সম্মানিত বংশীয় তবুও তারা

যত অপমানিতই হোক না কেন কোনো অনিষ্টের ক্ষমতা রাখে না[12]।

কোনো গুণকে অসাব্যস্ত করার অর্থ তার বিপরীত পূর্ণাঙ্গ গুণকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। এর উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٧]

আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মরবেন না। *(সূরা আল ফুরকান: ২৫: ৫৮)*

অতএব আল্লাহর জন্য মৃত্যুকে অসাব্যস্ত করার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা শামিল রয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ:

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝٤٩ ﴾ [الكهف: ٤٩]

আর তোমার রব কারো প্রতি জুলুম করেন না। *(সূরা আল কাহাফ: ১৮: ৪৯)*

---

[12] উভয় কবিই প্রকারান্তরে তাদের গোত্রের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথাই প্রকাশ করেছে। [সম্পাদক]

অতএব আল্লাহর জন্য জুলুম অসাব্যস্ত করার মধ্যে তাঁর জন্যে পূর্ণাঙ্গ ইনসাফ সাব্যস্ত করা শামিল রয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعۡجِزَهُۥ مِن شَيۡءٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ [فاطر: ٤٤]

> আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও জমমেনের কোনো কিছু তাকে অক্ষম করে দেবে। *(সূরা ফাতির: ৩৫: ৪৪)*

এখানে আল্লাহ তা'আলার জন্য অক্ষমতাকে অসাব্যস্ত করা হয়েছে। আর অক্ষমতাকে অসাব্যস্ত করার মধ্যে আল্লাহর জন্য ইলম ও কুদরতকে পূর্ণাঙ্গরূপে সাব্যস্ত করা শামিল রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষে বলেছেন:

إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمٗا قَدِيرٗا

> নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। *(সূরা ফাতির: ৩৫: ৪৪)*

কেননা অক্ষমতার কারণ হয়তো কোনো কিছুকে অস্তিত্বদানের কার্যকারণের ব্যাপারে অজ্ঞতা, অথবা ক্ষমতার অপ্রতুলতা। আর আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ

ইলমের অধিকারী এবং আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁর ক্ষমতাকে খর্বকারী কেউ নেই।

এ উদাহরণ থেকে জানা গেল যে অসাব্যস্তজাত গুণগুলো কখনো কখনো একাধিক পূর্ণাঙ্গতাকে শামিল করে।

চতুর্থ মূলনীতি:

সাব্যস্তজাত গুণগুলো প্রশংসা ও পূর্ণাঙ্গসূচক গুণ। অতএব এসব গুণ যত বেশি হবে এবং এসবের অর্থে যত বেশি বিভিন্নতা আসবে, যিনি এসব গুণে গুণান্বিত তাঁর পূর্ণাঙ্গতা তত অধিক প্রকাশ পাবে।

এ কারণেই যেমনটি সর্বজন বিদিত যে, সাব্যস্তজাত যেসব গুণের কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তা অসাব্যস্তজাত গুণ থেকে অনেক বেশি।

এর বিপরীতে অসাব্যস্তজাত গুণগুলো কেবল তিন অবস্থায় উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত. আল্লাহর পূর্ণাঙ্গতার ব্যাপকতা বোঝানোর অবস্থায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

তাঁর মত কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা আশশুরা:৪২: ১১)*[১৩]

﴿ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤ ﴾ [الاخلاص: ٤]

আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই। *(সূরা আল ইখলাস: ১১২: ৪)*

দ্বিতীয়ত: মিথ্যাবাদীরা আল্লাহর ব্যাপারে যা দাবি করেছে তা নস্যাৎ করার অবস্থায়। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

﴿ أَن دَعَوۡاْ لِلرَّحۡمَٰنِ وَلَدٗا ٩١ وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢ ﴾ [مريم: ٩١، ٩٢]

কারণ তারা পরম করুণাময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়। *(সূরা মারয়াম: ১৯: ৯১-৯২)*

তৃতীয়ত: এই সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গতায় কোনো কমতি থাকতে পারে এ ধরনের ধারণা নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ ١٦ ﴾ [الانبياء: ١٦]

[১৩] - দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে আমীন আশশানকিতী, আদওয়াউল বয়ান, ------

আসমান-জমিন ও তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুই আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। *(সূরা আল আম্বিয়া: ২১: ১৬)*

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٖ ٣٨ ﴾ [ق: ٣٨]

আর অবশ্যই আমি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। আর আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। *(সূরা ক্বাফ: ৫০: ৩৮)*

পঞ্চম মূলনীতি: সাব্যস্তজাত গুণ দু'ভাগে বিভক্ত। আল্লাহর সত্তাসংলগ্ন গুণ ও তাঁর কর্মসংলগ্ন গুণ।

- সত্তাসংলগ্ন গুণ হলো, যেগুলো অনাদি কাল থেকে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে রয়েছে এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে। যেমন ইলম, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন, পরাক্রমশীলতা, হিকমত, সর্বোচ্চতা, 'আযমত। এর মধ্যে সংবাদজাত গুণ যেমন চেহারা, দু'হাত, দু'চোখ ইত্যাদিও শামিল

রয়েছে।

- আর কর্মসংলগ্ন গুণ হলো ওইসব গুণ, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এমন সব কর্ম যা আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে করেন এবং ইচ্ছা না করলে করেন না। যেমন আরশের ওপর উঠা এবং নিম্নাকাশে অবতরণ করা।

আবার কখনও কখনও সিফাতে যাতিয়া অর্থাৎ সত্তাসংলগ্ন গুণ দু'ভাবে কর্মসংলগ্ন গুণও হতে পারে, যেমন কালাম বা কথা। এ গুণটি তার মৌলিকতার বিবেচনায় সিফাতে যাতিয়া (সত্তাসংলগ্ন গুণ); কেননা আল্লাহ তা'আলা অনাদি অনন্তকাল ধরে মুতাকাল্লিম থেকেছেন এবং থাকবেন। আর সুনির্দিষ্ট কোনো কথার ক্ষেত্রে 'কালাম' গুণটি সিফাতে ফি'লিয়া তথা কর্মসংলগ্ন গুণ। কেননা কথা বলা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি যখন যা ইচ্ছা করেন বলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]

নিশ্চয়ই তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, কোন কিছুকে তিনি যদি 'হও' বলতে চান, তখনই তা হয়ে যায়। *(ইয়াসীন: ৩৬: ৮২)*

﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الانسان: ٣٠]

আর আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা করতে পারবে না; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ। *(সূরা আল ইনসান:৩০)*

ষষ্ঠ মূলনীতি: সিফাত (গুণাগুণ) সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে বড় দুটি নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত থাকা খুবই জরুরি। এর একটি হলো 'তামছীল' (সাদৃশ্য নির্ধারণ) আর অপরটি হলো 'তাকয়ীফ' (ধরণ নির্ধারণ)।

'তামছীল' হলো, গুণাগুণ সাব্যস্তকারী ব্যক্তির এ বিশ্বাস আসা যে, আল্লাহর জন্য সে যে গুণাগুণ সাব্যস্ত করছে তা সৃষ্টিজীবের গুণাগুণের অনুরূপ (সৃষ্টিজীবের গুণাগুণের মতো)। এ ধরনের বিশ্বাস বাতিল বিশ্বাস। এর প্রমাণ ওহী ও মানববুদ্ধি।

ওহী থেকে এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ [الشورى: ١١]

তার মত কিছু নেই। *(সূরা আশ-শূরা: ৪২: ১১)*

তিনি আরো বলেন:

﴿ أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٧ ﴾ [النحل: ١٧]

সুতরাং যে সৃষ্টি করে, সে কি তার মত, যে সৃষ্টি করে না? অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ১৭)*

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥ ﴾ [مريم: ٦٥]

তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান? *(মারয়াম: ১৯: ৬৫)*

আরো বলেন:

﴿ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤ ﴾ [الاخلاص: ٤]

আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই। *(সূরা আল ইখলাস: ১১২: ৪)*

মানববুদ্ধির দলিল

প্রথমত: এটা স্বতসিদ্ধভাবে জানা যে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিবস্তুর মধ্যে সত্তাগতভাবে পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের দাবি হলো এ উভয়ের মধ্যে

গুণের ক্ষেত্রেও পার্থক্য হবে। কেননা প্রত্যেক গুণান্বিতের তার উপযুক্ত গুণ বা সিফাত থাকে। এটা ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকার মধ্যে স্পষ্ট। উদাহরণত উটের ক্ষমতা ও পরমাণুর ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অতএব যদি সৃষ্টিবস্তুর গুণের মধ্যে পরস্পরে পার্থক্য থাকে যদিও তারা সৃষ্টিবস্তু হওয়া হিসেবে সমতুল্য, তাহলে সৃষ্টবস্তু ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি তো আরো স্পষ্ট এবং অধিক শক্তিশালী।

দ্বিতীয়ত: যিনি সৃষ্টকর্তা রব, যিনি সকল দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ তিনি গুণের ক্ষেত্রে কীভাবে সৃষ্টিবস্তুর সমতুল্য হবেন যে নাকি অপূর্ণাঙ্গ ও মুখাপেক্ষী। অতএব যদি কেউ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিবস্তু সমতুল্য বলে বিশ্বাস করে তবে তার এ বিশ্বাস সৃষ্টিকর্তার অধিকারকে খর্ব করবে; কেননা যিনি পূর্ণাঙ্গ তাকে অপূর্ণাঙ্গের সঙ্গে উদাহরণ দেওয়া পূর্ণাঙ্গকে অপূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া।

তৃতীয়ত: সৃষ্টিবস্তুর মধ্যেও এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে নামের ক্ষেত্রে অভিন্নতা থাকলেও প্রকৃতি ও ধরন-ধারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। যেমন মানুষের যে হাত রয়েছে তা হাতির হাতের মত নয়। মানুষের শক্তি উটের শক্তির মত নয়। যদিও নাম অভিন্ন। অর্থাৎ এটাও হাত এবং ওটাও হাত। এটাও শক্তি আর ওটাও শক্তি। তবে ধরন-ধারণ ও গুণবৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে নাম এক হলেও প্রকৃতিগতভাবে সমতুল্য হওয়া জরুরি নয়।

আর ‘তাশবীহ’ অর্থাৎ সাদৃশ্য নির্ণয় করা ‘তামছীল’ তথা সমতুল্য বলে ধারণা করার মতই। তবে এ দুটির মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা যেতে পারে যে, ‘তামছীল’ হলো সকল সিফাতের ক্ষেত্রে সমতুল্য বলে ধারণা করা। আর তাশবীহ হলো অধিকাংশ গুণের ক্ষেত্রে সমতুল্য বলে ধারণা করা। তবে ‘তামছীল’ শব্দটি ব্যবহার করাই হবে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা এ ক্ষেত্রে আল কুরআনে একই ধাতুর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ [الشورى: ١١]

তার মত কিছু নেই। *(সূরা আশশুরা: ৪২: ১১)*

‘তাকয়ীফ’: তাকয়ীফ হলো সুনির্দিষ্ট কোনো উদাহরণযুক্ত না করেই আল্লাহ তা‘আলার সিফাতের ব্যাপারে ধারণা করা যে তার ধরন এই এই। যেমন কেউ বলল, আল্লাহ তা‘আলার চেহারা আছে আর তার আকার-আকৃতি হলো এই এই। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো মাখলুকের চেহারার উদাহরণ উল্লেখ করল না। এ ধরনের বিশ্বাসও বাতিল বিশ্বাস। এর প্রমাণ ওহী ও মানববুদ্ধির যুক্তি।

ওহী থেকে প্রমাণ হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ١١٠﴾ [طه: ١١٠]

কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না। *(সূরা তাহা: ২০: ১১০)*

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦ ﴾ [الاسراء: ٣٦]

আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ - এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সূরা আল ইসরা: ১৭: ৩৬)*

এটা স্পষ্ট যে আমাদের রব তা'আলার সিফাতের ধরন-ধারণ কি তা আমাদের জানা নেই। কেননা তিনি সিফাত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, কিন্তু সিফাতের আকার-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জানাননি। অতএব সিফাতের আকার-প্রকৃতি বর্ণনা করার অর্থ এমন বিষয়ে কথা বলা যে বিষয়ে আমাদের আদৌ কোনো জ্ঞান নেই।

মানববুদ্ধির দলিল হলো: কোনো একটি জিনিসের গুণবৈশিষ্ট্যের আকার-প্রকৃতি ওই জিনিসটির সত্তার আকার-প্রকৃতির ব্যাপারে জ্ঞান লাভের পর অথবা ওই জিনিসটির সমতুল্য কোনো জিনিসের জ্ঞান লাভের পর অথবা

ওই জিনিস সম্পর্কে সত্যবাদী কোনো ব্যক্তির সংবাদের পরই সম্ভব।

আর আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ক্ষেত্রে উল্লিখিত এ তিনটি পন্থার কোনোটিই প্রযোজ্য নয়। অতএব 'তাকয়ীফ' প্রক্রিয়াকে বাতিল বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সিফাতের আকার-প্রকৃতি কি তা জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

উপরন্তু আমরা এ প্রশ্ন করতে পারি যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার সিফাতের জন্যে কি ধরনের আকার-প্রকৃতি নির্ধারণ করবেন?

কারণ আপনি আপনার বুদ্ধি-বিচার দ্বারা যে ধরনের আকার-প্রকৃতিই নির্ধারণ করুন না কেন আল্লাহ তা'আলা তার থেকেও বড় ও সম্মানিত।

আর আপনি যে ধরনের আকার-প্রকৃতি নির্ধারিত করবেন তাতে আপনি নিশ্চিতরূপেই মিথ্যাবাদী হবেন; কেননা এ ব্যাপারে আপনার কোনো ইলম নেই।

অতএব আল্লাহ তা'আলার সিফাতের ব্যাপারে সকল প্রকার 'তাকয়ীফ' তথা আকার-প্রকৃতি নির্ধারণ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। হোক তা অন্তরের কল্পনা দ্বারা অথবা জিহ্বার কথা দ্বারা অথবা হাত দ্বারা লিখার মাধ্যমে।

এ ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস কি হবে তার ব্যাখ্যা খোঁজে পাওয়া যায় ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ উক্তিতে, যা তিনি নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন। আয়াতটি হলো:

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ ﴾ [طه: ٥]

দয়াময় (আল্লাহ) আরশের উপর উঠেছেন। *(সূরা তাহা: ২০: ৫)*

উক্ত আয়াতের নিরিখে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে কীভাবে উঠেছেন?' প্রশ্নটি শোনে ইমাম মালিক র. মাথা নিচু করলেন, এমনকি তাঁর কপাল থেকে ঘাম বেরুতে শুরু করল। এরপর তিনি বললেন:

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

অর্থাৎ (ইস্তিওয়া তথা 'ওপরে ওঠা' অজানা নয়, আর আকার-প্রকৃতি বোধগম্য নয় [অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষেত্রে ইস্তিওয়া শব্দের অর্থের আকার-প্রকৃতি কি তা বোধগম্য নয়] তবে এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা বিদ'আত।) ইমাম মালিক র. এর উস্তাদ রাবিয়া র. এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: ('ইস্তিওয়া' (উপরে উঠা) অজানা

নয়, আর এর ধরন-ধারণ বোধগম্য নয়।)

তাদের দুজনের পর আলেমগণ উল্লিখিত নীতির উপরই চলেছেন। আর যদি আকার-প্রকৃতি বোধগম্য বিষয় না হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তেও কোনো স্পষ্ট বক্তব্য উল্লিখিত না হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হলো যে যুক্তি ও শরীয়ত উভয়টিই আকার-প্রকৃতি নির্ধারণমূলক সকল দলিল থেকে মুক্ত। অতএব এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

সুতরাং খুব সাবধান হোন আকার-প্রকৃতি নির্ধারণ এবং এ জাতীয় যেকোনো প্রয়াস থেকে; কেননা যদি এরূপ কাজে আপনি নিপতিত হন তবে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন হবে। আর যদি আপনার অন্তরে এ জাতীয় কোনো কিছু উদিত হয়, তবে নিশ্চিতরূপে জানুন যে তা শয়তানের কুমন্ত্রণা। এ ক্ষেত্রে আপনি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন; কেননা একমাত্র তিনিই আশ্রয় দাতা। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٣٦ ﴾

[فصلت: ٣٦]

আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

(সূরা ফুসসিলাত: ৪১: ৩৬)

সপ্তম মূলনীতি: আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ ওহীনির্ভর। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি বিবেচনার কোনো স্থান নেই।

অতএব আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন কোনো সিফাত বা গুণবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব না যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। ইমাম আহমদ র. বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণের কথা উল্লেখ করেছেন তা ব্যতীত অন্যকোনো গুণ আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করা শুদ্ধ হবে না। এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহকে অতিক্রম করা যাবে না। (দেখুন আল্লাহ তা'আলার নাম-বিষয়ক পঞ্চম মূলনীতি)

নির্দিষ্ট কোনো সিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত কি না তা কুরআন-সুন্নাহ থেকে তিনভাবে প্রমাণিত করা যাবে:

প্রথমত: সিফাতটি সরাসরি উল্লিখিত থাকা: যেমন আল ইয্যাহ (শক্তি), আল কুউয়াহ (শক্তি), আর রাহমাহ (রহমত), আল বাৎশ (পাকড়াও করা), আল ওয়াজহ (চেহারা), আল য়াদাইন (দু'হাত)। এসব সিফাত সরাসরি উল্লিখিত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: সিফাত সংবলিত নাম উল্লিখিত থাকা: যেমন আল গাফুর (ক্ষমাশীল), এ নামটি 'আল মাগফিরাহ' (ক্ষমা) সিফাতকে শামিল করে আছে। আস্‌সামীউ' (সর্বশ্রোতা), এ নামটি আস্‌সাসাম্‘উ (শ্রবণ) সিফাতকে শামিল করে আছে। (দেখুন: নাম সম্পর্কে তৃতীয় নীতি)

তৃতীয়ত: সরাসরি কোনো ক্রিয়াপদ অথবা ক্রিয়াপদের অর্থ প্রকাশক শব্দ উল্লিখিত থাকা যা সিফাতকে নির্দেশ করে: যেমন আরশের ওপরে ওঠা, নিম্নাকাশে অবতরণ করা, কিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আসা, অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া। উল্লিখিত প্রতিটি সিফাত নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসে ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত রয়েছে:

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ ﴾ [طه: ٥]

দয়াময় যিনি আরশের ওপরে উঠেছেন। *(সূরা তাহা: ২০: ৫)*

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস:

«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا»

(আমাদের রব প্রতি রাতেই নিম্নাকাশে অবতরণ করেন)

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ٢٢ ﴾ [الفجر: ٢٢]

আর তোমার রব ও ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন সারিবদ্ধভাবে। *(সূরা আল ফাজর: ৮৯: ২২)*

এবং সবশেষে বলেন:

﴿إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢ ﴾ [السجدة: ٢٢]

নিশ্চয় আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। *(সূরা আস্‌সাজদা: ৩২: ২২)*

তৃতীয় অধ্যায়:

নাম ও সিফাত প্রমাণকারী দলিল-বিষয়ক মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি: নাম ও সিফাত প্রমাণের উৎস বা দলিল হলো মাত্র দুটি। একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

সুতরাং এ দুটির বাইরে অন্যকোনো দলিল দ্বারা আল্লাহর নাম ও সিফাত প্রমাণিত হবে না।

অতএব কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য যেসব নাম ও সিফাত প্রমাণিত হয়েছে তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যকীয়। আর কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়নি তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না করা আবশ্যকীয়। পাশাপাশি যা সাব্যস্ত হয়নি তার বিপরীতে যে পূর্ণাঙ্গ গুণ রয়েছে তা সাব্যস্ত করা আবশ্যকীয়। আর যে বিষয়টি কুরআন সুন্নায়

সাব্যস্তও হয়নি এবং অসাব্যস্তও হয়নি সে বিষয়টি নির্দেশকারী শব্দের ব্যাপারে হাঁ বা না কোনোটিই বলা যাবে না। বলা যাবে না যে এ শব্দটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত অথবা সাব্যস্ত নয়। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহ যেহেতু এ জাতীয় শব্দের ব্যাপারে নীরব থেকেছে কাজেই আমাদেরও নীরব থাকতে হবে।

আর এ জাতীয় শব্দের অর্থের ব্যাপারে বলা যায় যে, তা যদি এমন হয় যা আল্লাহ তা'আলার জন্য উপযোগী তবে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা বৈধ। আর যদি এমন হয় যা আল্লাহর জন্য উপযোগী নয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব।

অতএব কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী যেসব সিফাত আল্লাহর জন্য প্রমাণিত তা হলো:

- প্রত্যেক ওই সিফাত যা আল্লাহ তা'আলার নামের সরাসরি নির্দেশনা হিসেবে প্রমাণিত অথবা এমন সিফাত যা আল্লাহ তা'আলার নামে সংবলিত রয়েছে অথবা এমন সিফাত যা আল্লাহ তা'আলার নামের দাবিগত অর্থ হিসেবে প্রমাণিত।
- আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রমাণিত সিফাতসমূহের মধ্যে আরেক প্রকার হলো ওইসব সিফাত যা নির্দেশকারী হলো আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্রিয়া। যেমন আরশের ওপরে ওঠা, নিম্নাকাশে অবতরণ করা,

কিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য আসা এবং এ জাতীয় আরো অন্যান্য ক্রিয়া যা গুণে শেষ করা সম্ভব নয়; কেননা আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٢٧﴾ [ابراهيم: ٢٧]

আর আল্লাহ তা'আলা তা করেন যা তিনি চান। *(সূরা ইব্রাহীম: ১৪: ২৭)*

- অনুরূপ **প্রমাণিত সিফাতের মধ্যে আরও রয়েছে:** চেহারা, দু'চোখ, দু'হাত ইত্যাদি।
- প্রমাণিত সিফাতের মধ্যে আরো আছে: কালাম বা কথা, ইচ্ছা এবং চাওয়া- হোক তা মহাবৈশ্বয়িক অথবা শরীয়ত-কেন্দ্রিক। তন্মধ্যে মহাবৈশ্বয়িক হচ্ছে তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা (যার সাথে তাঁর শরীয়তগত চাওয়া কিংবা ভালোবাসার সম্পর্ক নেই) আর দ্বিতীয় চাওয়াটি হচ্ছে শরীয়তগত এবং তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে।
- প্রমাণিত সিফাতের মধ্যে আরো শামিল রয়েছে: সন্তুষ্টি, মহব্বত, রাগ ও ঘৃণা ইত্যাদি।

আর যেসব সিফাত আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত না হওয়া প্রমাণিত এবং এর বিপরীত পূর্ণাঙ্গ সিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত তা হলো:

- মৃত্যু, নিদ্রা, তন্দ্রা, অক্ষমতা, ক্লান্তি, যুলম, বান্দাদের আমল সম্পর্কে উদাসীনতা, আল্লাহ তা'আলার কোনো সমতুল্য বা সমকক্ষ থাকা ইত্যাদি।

আর যে সব গুণনির্দেশক শব্দ আল্লাহর জন্য সাব্যস্তও করা হয়নি এবং অসাব্যস্তও করা হয়নি, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- (الجهة) অর্থাৎ দিক। অতএব কেউ যদি প্রশ্ন করে বলে যে, আমরা কি আল্লাহর জন্য দিক শব্দটিকে সাব্যস্ত করব? এ প্রশ্নের উত্তরে বলব যে 'দিক' শব্দটি কুরআন-সুন্নায় আসেনি। হাঁ এবং না কোনোভাবেই আসেনি। অতএব 'দিক' শব্দের ক্ষেত্রে হাঁ ও না কোনোটিই সাব্যস্ত না করে এক্ষেত্রে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা উপরে আছেন। আর 'দিক' শব্দটির যে অর্থ তার দ্বারা হয়ত নিম্নদিক বুঝানো হবে, অথবা এমন ঊর্ধ্বদিক বুঝানো হবে যা আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করে আছে অথবা এমন ঊর্ধ্ব দিক বুঝানো হবে যা আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করে নেই। তন্মধ্যে:

প্রথমটি অর্থাৎ নিম্নদিক আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য নয়, তা বরং বাতিল; কেননা তা আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বতা, যা কুরআন-সুন্নাহ, যুক্তি, ফিতরত ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ এমন ঊর্ধদিক যা আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টনকারী, এটিও আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তা বরং বাতিল; কারণ কোনো সৃষ্টবস্তু দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পরিবেষ্টিত থাকবেন তা থেকে তিনি পবিত্র ও মহান।

তৃতীয়টি অর্থাৎ এমন ঊর্ধ্বদিক যা আল্লাহ তা'আলাকে পরিবেষ্টন করে

নেই। এটি আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য এবং তা সত্য; কেননা আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং সৃষ্টির কোনো কিছুই তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

এই মূলনীতির পক্ষে দলিল হলো ওহী ও যুক্তি:

- **ওহী থেকে দলিল হলো** আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীসমূহ:

﴿ وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٥٥ ﴾ [الانعام: ١٥٥]

আর এটি কিতাব- যা আমি নাযিল করেছি- বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও। *(সূরা আল আনআম: ৬: ১৫৫)*

﴿فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨ ﴾ [الاعراف: ١٥٨]

সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়েত লাভ করবে। *(সূরা আল আরাফ: ৭: ১৫৮)*

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧]

রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। *(সূরা আল হাশর: ৫৯: ৭)*

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠ ﴾ [النساء: ٨٠]

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি। *(সূরা আন নিসা:: ৪: ৮০)*

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩ ﴾ [النساء: ٥٩]

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ।

এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। *(সূরা আন নিসা: ৪: ৫৯)*

﴿ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ﴾ [المائدة: ٤٩]

আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। *(সূরা আল মায়েদা: ৫: ৪৯)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য আয়াত যা কুরআন-সুন্নাহর প্রতি ঈমান আনাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করে। আর প্রত্যেক ওই আয়াত যা কুরআনের প্রতি ঈমান আনাকে ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করে তা সুন্নাহর মাধ্যমে যা কিছু এসেছে তার প্রতিও ঈমান আনাকে আবশ্যক বলে সাব্যস্ত করে; কেননা আল কুরআনে যেসব নির্দেশ এসেছে তন্মধ্যে একটি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা এবং বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করা। সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করা তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর সুন্নতের কাছে সোপর্দ করা তাঁর মৃত্যুর পর।

অতএব, যে ব্যক্তি আল কুরআনের প্রতি ঈমান রাখার দাবি করে অথচ আল কুরআনের নির্দেশ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

অনুসরণের ব্যাপারে দম্ভ প্রদর্শন করে, সে কীভাবে আল কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হতে পারে?

আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিতর্কিত বিষয় রাসূলুল্লাহর কাছে সোপর্দ করে না, সে আল কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবিতে কীভাবে সত্যবাদী হতে পারে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় যা কিছু এসেছে, তা গ্রহণ করার ব্যাপারে আল কুরআনে নির্দেশ আসা সত্ত্বেও যে তা গ্রহণ করে না, সে কীভাবে আল কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হতে পারে?

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: ٨٩]

> আর আমরা তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনাস্বরূপ। *(সূরা আন্-নাহল:৮৯)*

আর এটা স্পষ্ট যে ইসলামী শরীয়তের তথ্যগত ও প্রায়োগিক বহু বিষয়ের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মাধ্যমে এসেছে।

অতএব সুন্নাহর মাধ্যমে বর্ণিত হওয়া প্রকারান্তরে কুরআনের মাধ্যমেই বর্ণিত হওয়া।

যুক্তি: আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনটি সাব্যস্ত করা ওয়াজিব, কোনটি সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ এবং কোনটি বৈধ, এ বিষয়গুলো গায়েবের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তা এমন বিষয় যা মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা নির্ণয় করতে পারে না। অতএব এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর আশ্রয়ে যাওয়া ওয়াজিব।

দ্বিতীয় মূলনীতি: কুরআন-সুন্নাহর শব্দসমূহকে বিকৃত না করে তার প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করা ওয়াজিব, বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার সিফাত কেন্দ্রিক শব্দমালা; কেননা এ ক্ষেত্রে মানববুদ্ধির কোনো স্থান নেই।

এর দলিল ওহী ও যুক্তি।

ওহী থেকে দলিল:

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীসমূহ ওহী-কেন্দ্রিক দলিল:

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٥]

> বিশ্বস্ত আত্মা[১৪] এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। *(সূরা আশশু'আরা: ২৬: ১৯৩-১৯৪)*

অন্য আয়াতে আছে:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢ ﴾ [يوسف: ٢]

> নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। *(সূরা ইউসূফ: ১২: ২)*

আর একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٣ ﴾ [الزخرف: ٣]

> নিশ্চয় আমি তো একে আরবী কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। *(সূরা আয্যুখরুফ: ৪৩: ৩)*

এ আয়াতগুলোর বক্তব্য অনুযায়ী আরবী ভাষার শব্দমালা যে প্রকাশ্য অর্থসমূহ দাবি করে সে অনুযায়ী আল কুরআনকে বুঝতে হবে। যদি না কোনো শরঈ দলিল ভিন্ন অর্থ নেওয়াকে নির্দেশ করে।

---

[১৪] এখানে 'বিশ্বস্ত আত্মা' দ্বারা জিবরীল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে।

ইহুদী সম্প্রদায় বিকৃতি সাধনের আশ্রয় নিয়েছিল, যে কারণে তারা আল্লাহ তা'আলার ভৎর্সনার পাত্র হয়েছিল এবং তারা যে এ বিকৃতিকরণের দ্বারা ঈমান থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিল তাও আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ ۞أَفَتَطۡمَعُونَ أَن يُؤۡمِنُواْ لَكُمۡ وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥ ﴾ [البقرة: ٧٥]

তোমরা যারা বিশ্বাসী কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত জেনে বুঝে। *(সূরা আল বাকারা: ২: ৭৫)*

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ وَيَقُولُونَ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا﴾ [النساء: ٤٦]

ইয়াহূদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা

কালামসমূহকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং বলে, 'আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম'। *(সূরা আন-নিসা: ৪: ৪৬)*

যুক্তি: আল কুরআনের বাণীসমূহ যার পক্ষ থেকে এসেছে, অন্যদের তুলনায় তিনিই এর অর্থ অধিক বোঝেন। আর তিনি স্পষ্ট আরবী ভাষায় এ বাণীগুলো পাঠিয়েছেন। অতএব তা প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করা ওয়াজিব বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় ভিন্ন ভিন্ন অভিমতের অনুপ্রবেশ ঘটবে, ফলে উম্মত বিভক্ত হয়ে পড়বে।

তৃতীয় মূলনীতি: সিফাত সংবলিত বাণীসমূহের প্রকাশ্য অর্থ এক হিসেবে আমাদের জানা আর অন্য হিসেবে আমাদের জন্য তা অজ্ঞাত।

এ বাণীসমূহের প্রকাশ্য অর্থ কি তা আমাদের জ্ঞাত, কিন্তু এ অর্থের 'কাইফিয়াত' তথা আকার-প্রকৃতি বা ধরণ কি তা আমাদের অজ্ঞাত।

এ কথার পক্ষে দলিল হলো ওহী ও যুক্তি।

- **ওহী থেকে দলিল:**

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীসমূহ এ ক্ষেত্রে ওহী-কেন্দ্রিক দলিল:

﴿ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٩ ﴾ [ص: ٢٩]

আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা সাদ: ৩৮: ২৯)*

অন্য এক আয়াতে এসেছে:

﴿ إِنَّا جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٣ ﴾ [الزخرف: ٣]

নিশ্চয় আমি তো একে আরবী কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। *(সূরা আয্‌যুখরুফ: ৪৩: ৩)*

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤ ﴾ [النحل: ٤٤]

এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে। *(সূরা আন্-*

নাহল: ১৬: ৪৪)

আর চিন্তা-গবেষণা তো সেটাতেই চলে যাতে চিন্তা করলে তা বুঝে তা থেকে অন্যকে বুঝানো সম্ভব হয়।

আর কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার অর্থ তো যারা আরবী ভাষা জানে তারা যেন তা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে; এটা প্রমাণ করে যে এর অর্থ আমাদের জানা, নতুবা আরবী ভাষা ও অন্য ভাষায় নাযিল করার মধ্যে পার্থক্য হতো না।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মানুষের জন্য কুরআনের বর্ণনা সেটা তার শব্দ ও অর্থ উভয়কেই যথাযথভাবে শামিল করে।

- **যুক্তি:** এটা অসম্ভব যে আল্লাহ তা'আলা এমন কিতাব নাযিল করবেন এবং তাঁর রাসূলের কাছে এমন কথা পাঠাবেন যার উদ্দেশ্য হবে মানুষের হিদায়েত অথচ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে তা থাকবে অজ্ঞাত অর্থবোধক অথবা এমন খন্ডাক্ষরের ন্যায় যা থেকে কোনো কিছুই বোঝা যায় না। এরূপ হলে তা হবে আল্লাহ তা'আলার হিকমতবিরুদ্ধ। আর তাইতো আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿ الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝١ ﴾ [هود: ١]

এটি কিতাব যার আয়াতসমূহ সুস্থিত করা হয়েছে, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্ত্বার পক্ষ থেকে। *(সূরা হূদ: ১১: ১)*

সিফাত-বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যসমূহের বাহ্যিক অর্থ যে আমাদের জানা, তার পক্ষে ওহী ও যুক্তিভিত্তিক দলিল ওপরে পেশ করা হলো।

আর আমরা যে সিফাত-বিষয়ক কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্যসমূহের বাহ্যিক অর্থ জানা সত্ত্বেও তার বাস্তব আকার-প্রকৃতি বা ধরণ কি সে ব্যাপারে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই এ কথার পক্ষে ওহী ও যুক্তিভিত্তিক দলিল সিফাত-বিষয়ক ষষ্ঠ মূলনীতিতে উল্লিখিত হয়েছে।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে 'মুফাউয়েযা' সম্প্রদায় যা বলে তা বাতিল। মুফাউয়েযা সম্প্রদায় হলো তারা যারা সিফাত-বিষয়ক কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যসমূহের অর্থ আল্লাহর ইলমের কাছে সোপর্দ করেন। অর্থাৎ তারা বলেন, এসবের বাহ্যিক অর্থ আমাদের জানা নেই, বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এসবের অর্থ সম্পর্কে ইলম রাখেন। তারা দাবি করেন যে এটাই হলো সালাফে সালেহীনদের মাযহাব। অথচ সালাফগণ এ জাতীয় চিন্তাধারা

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। সালাফদের থেকে বরং অকাট্য বর্ণনা পরম্পরায় এসব টেক্সট বা ভাষ্যের অর্থ সাব্যস্ত করার কথা এসেছে। কখনো এজমালি অর্থ আবার কখনো বিস্তারিত অর্থ। তবে এ অর্থের বাস্তব আকার-প্রকৃতি কি, তা তারা আল্লাহ তা'আলার ইলমের কাছে সমর্পণ করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ র. তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আকল ও নকল' এর প্রথম খন্ডের ১১৬ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন: 'আর তাফওয়ীয (অর্থাৎ আল্লাহর ইলমের কাছে সমর্পণ করা) এর ব্যাপারে বলব, এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা, বুঝা ও তার অর্থোদ্ধারের জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আল কুরআন বুঝা, আল কুরআন জানা এবং তার অর্থোদ্ধার করা থেকে বিমুখ হওয়া কীভাবে কাম্য হতে পারে? এরপর তিনি ১১৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন: 'কথা যদি এ রকমই হত, তাহলে বলতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে নিজের সিফাত সম্পর্কে যা যা বলেছেন, অথবা এ ব্যাপারে অধিকাংশ বিষয় যা তিনি বলেছেন, তার অর্থ নবীগণও বুঝতেন না। বরং তারা এমন কথা বলতেন যার অর্থ তাদের কাছে বোধগম্য ছিল না। বলাবাহুল্য যে এটা আল কুরআন এবং নবীগণ উভয়কেই দোষারোপ করা; কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে তা তিনি হিদায়েত ও মানুষের জন্য বর্ণনাস্বরূপ নাযিল করেছেন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যেন তা

স্পষ্টাকারে পৌঁছিয়ে দেন। তিনি যেন মানুষের জন্য স্পষ্টরূপে বয়ান করে দেন তাদের ওপর কি নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন, তিনি তা বুঝতে বলেছেন। এর পাশাপাশি আল কুরআনের সর্বোত্তম বিষয় হলো রাব্বুল আলামীন তাঁর সিফাত বিষয়ক যে বাণীগুলো নাযিল করেছেন। অতএব এটা কীভাবে বলা শুদ্ধ হতে পারে যে, এসবের অর্থ কেউ জানে না, এসব বোধগম্য নয়। এটা কি হতে পারে যে মানুষের জন্য যা নাযিল হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছাননি? অথচ এই ধারণার ওপর নির্ভর করেই প্রত্যেক মুলহিদ ও বিদআতপন্থী বলে যে, প্রকৃত সত্য হলো তা যার ইলম আমি নিজ মত ও বুদ্ধির মাধ্যমে পেয়েছি, আর কুরআন-সুন্নাহর টেক্সট বা ভাষ্যে আমার মতের বিপরীত কিছু নেই; কেননা ওইসব টেক্সট বা ভাষ্য দুর্বোধ্য, মুতাশাবিহ, কেউ তার অর্থ বোঝে না। আর যার অর্থ কেউ জানে না তা দ্বারা দলিল দেওয়া শুদ্ধ নয়। এ জাতীয় কথার অর্থ হলো নবীগণের পক্ষ থেকে যে হিদায়েত এসেছে তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া এবং যারা তাদের বিরোধী তাদের দরজা উন্মুক্ত করা। এরূপ ব্যক্তি প্রকারান্তরে বলে যে হিদায়েত ও বয়ান আমাদের পথে, নবীগণের পথে নয়; কেননা আমরা যা বলি তার অর্থ আমরা জানি এবং মানুষের জন্য তা যুক্তিভিত্তিক দলিল দ্বারা বয়ান করি। আর নবীগণ যা বলতেন তার অর্থ তারা বুঝতেন না, অতএব মানুষের জন্য তা বয়ান

করার তো প্রশ্নই আসে না।

এ আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে আহলে তাফউয়ীয তথা এগুলো বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর কাছে সমর্পণকারী সম্প্রদায়, যারা সুন্নাতের অনুসারী এবং সালাফদের অনুসারী হিসেবে নিজেদের মনে করে, তাদের কথা ইলহাদ ও বিদআতপন্থীদের সকল কথার চেয়ে জঘন্য কথা।'

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ র. এর কথা এখানেই শেষ। তিনি সঠিক কথা বলেছেন যা পরিপক্ক চিন্তা থেকে উঠে এসেছে। এ কথার পর এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আর কিছু বলার থাকে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর অঢেল রহমত বর্ষণ করুন এবং জান্নাতে আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে একত্র করুন।

চতুর্থ মূলনীতি: কুরআন ও সুন্নাহর টেক্সট বা ভাষ্যসমূহের বাহ্যিক অর্থ তা-ই যা টেক্সট বা ভাষ্যসমূহ সামনে আসার পর তৎক্ষণাৎ মাথায় আসে। এ বাহ্যিক অর্থ কনটেক্সট বা বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক অনুযায়ী এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কথা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

একই শব্দ এক কনটেক্সট-এ এক অর্থ দেয় আবার অন্য কনটেক্সট-এ অন্য অর্থ দেয়। শব্দমালার গাঁথুনি একভাবে হলে তার অর্থ হয় এক

ধরনের আবার অন্যভাবে হলে তার অর্থ হয় অন্যধরনের।

যেমন আরবী القرية (আল কারইয়াহ) শব্দটির অর্থ কখনো হয় জাতি, আবার কখনো হয় বাড়িঘর যেখানে কোনো জাতির লোকেরা বসবাস করে।

প্রথম অর্থের উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَإِن مِّن قَرۡيَةٍ إِلَّا نَحۡنُ مُهۡلِكُوهَا قَبۡلَ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَوۡ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًاۚ﴾ [الاسراء: ٥٨]

আর এমন কোনো জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর আযাব দেব না। *(সূরা আল ইসরা: ১৭: ৫৮)*

দ্বিতীয় অর্থের উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী, যা ইবরাহীমের মেহমান ফিরিশতাগণ বলেছিলেন:

﴿إِنَّا مُهۡلِكُوٓاْ أَهۡلِ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِۖ﴾ [العنكبوت: ٣١]

নিশ্চয় আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করব।

(সূরা আল আনকাবুত: ১৯: ৩১)

আরেকটি উদাহরণ: আপনি হয়তো বলবেন যে, ‘আমি এ জিনিসটি আমার দু’হাত দিয়ে বানিয়েছি।’ এখানে আপনার দু’হাত এবং আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লিখিত দু’হাতের মধ্যে আদৌ কোনো সাদৃশ্য নেই। বাণীটি হলো এই:

﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّۖ﴾ [ص: ٧٥]

আমার দু’হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি। *(সূরা সাদ: ৩৮: ৭৫)*

আপনি যে বাক্যটি বলেছেন সেখানে ‘দু’হাত’কে সৃষ্টিজীব মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এখানে হাত বলতে তাই বুঝাবে যা সৃষ্টিজীবের জন্য উপযোগী। আর আল কুরআনের আয়াতে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দু’হাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব তা হবে এমন হাত যা সৃষ্টিকর্তার জন্য উপযোগী। সুতরাং স্বচ্ছ প্রকৃতি ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই এটা বলতে পারে না যে সৃষ্টিকর্তার হাত সৃষ্টিজীবের হাতের মতো অথবা এর উল্টো।

আরেকটি উদাহরণ এই যে, আপনি যদি বলেন: ‘আপনার কাছে তো শুধু যায়েদ।’ এবং ‘যায়েদ তো শুধু আপনার কাছে।’ তাহলে উভয় বাক্যের শব্দমালা অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অর্থের দিক থেকে আলাদা। প্রথম বাক্যের

অর্থ হলো যে আপনার কাছে যায়েদ ছাড়া অন্যকোনো মানুষ নেই। আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো, যায়েদ কোথাও নেই তবে আপনার কাছে। যায়েদের সঙ্গে আপনার কাছে অন্যান্য লোকজনও থাকতে পারে। অতএব শব্দের ঘটন-কাঠামোর কারণে অর্থের ভিন্নতা আসে এ বিষয়টি স্পষ্ট।

এ আলোচনার পর বলব যে, সিফাত-কেন্দ্রিক টেক্সট বা ভাষ্যসমূহের বাহ্যিক অর্থ তাই যা এ টেক্সট বা ভাষ্যগুলো দেখামাত্র মস্তিষ্কে আসে। আর এ ক্ষেত্রে মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়েছে:

প্রথম দল: এ টেক্সট বা ভাষ্যগুলো থেকে যে বাহ্যিক অর্থ বুঝা যায় সে অর্থকেই আল্লাহর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে এবং এ টেক্সটগুলোর অর্থনির্দেশ এখানেই সীমিত রেখেছে। এই দলটি হলো সালাফে সালেহীনদের দল; যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ যার ওপর ছিলেন তার ওপর একত্র হয়েছেন। যারা প্রকৃত অর্থে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা‘আত খেতাবে ভূষিত এবং এ খেতাবটি কেবল তাদের জন্যই।

তাঁরা উল্লিখিত বক্তব্যের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। যেমন ইবনে আবদিল বার র. বলেন, ‘আহলে সুন্নাত আল কুরআন ও সুন্নায় যেসব সিফাত উল্লিখিত হয়েছে তা স্বীকার করে নেওয়া ও তার ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা উক্ত সিফাতগুলোকে

রূপক অর্থে নয় বরং প্রকৃত অর্থে বহন করার ব্যাপারেও একমত হয়েছেন। তবে তারা কোনো অর্থেরই আকার-প্রকৃতি নির্ধারণ করেন না।

কাজী আবু ইয়া'লা তার কিতাব 'ইবতালুত তাবিল' এ উল্লেখ করেন, 'এই সংবাদগুলো [অর্থাৎ সিফাত-বিষয়ক টেক্সটগুলো] প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে তাবিল প্রক্রিয়ায় মশগুল হওয়াও বৈধ নয়। বরং এ টেক্সটগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থে বহন করা ওয়াজিব এবং এটাও বিশ্বাস করা ওয়াজিব যে তা আল্লাহ তা'আলার সিফাত; যা সৃষ্টিবস্তুর সিফাততুল্য নয়। আর এ ক্ষেত্রে 'তাশবীহ'তেও বিশ্বাস করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ র. ও অন্যান্য ইমামগণ যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। [ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ইবনে আবদুল বার ও কাজী আবু ইয়ালা থেকে উক্ত বক্তব্য তার 'আল ফাতওয়া আল হামুবিয়া'-এ উল্লেখ করেছেন। *(দ্র: মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৫,পৃষ্ঠা ৮৭ -৮৯)*

এটাই হলো বিশুদ্ধ মাযহাব এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ সোজা পথ। আর তা দু'কারণে:

<u>প্রথম কারণ:</u> আল্লাহ তা'আলার নাম ও সিফাত সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহয় যা এসেছে তার যথার্থ ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এ পথেই সম্ভব। বস্তুনিষ্ঠ ও ইনসাফপূর্ণভাবে যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নায় এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করবে তার সামনে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টাকারে ধরা পড়বে।

দ্বিতীয় কারণ: আমরা হয়তো বলব যে, সালাফগণ যা বলেছেন তাই হক ও সত্য অথবা বলব যে সালাফগণ ছাড়া অন্যান্যরা যা বলেছেন তা সত্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে দ্বিতীয় কথাটি বাতিল। কেননা দ্বিতীয় কথাটিকে বাতিল না বললে এর যুক্তিগত দাবি এটা দাঁড়ায় যে, সালাফগণ অর্থাৎ সাহাবী ও তাবে‘ঈগণ সরাসরি অথবা বাহ্যিকভাবে বাতিল কথা বলেছেন এবং একবারের জন্যও তারা সরাসরি ও বাহ্যিকভাবে যা বিশ্বাস করা ওয়াজিব এমন হক কথা বলেননি। এর অর্থ দাঁড়ায়, সালাফগণ হয়তো সত্য সম্পর্কে জাহেল ছিলেন অথবা সত্য তাদের জানা ছিল কিন্তু তারা তা গোপন করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সালাফগণ উভয় বিষয় থেকেই পবিত্র ছিলেন। অতএব সত্য যে কেবল সালাফগণের সঙ্গেই এতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকল না।

দ্বিতীয় দল: যারা সিফাত-বিষয়ক টেক্সটসমূহের বাহ্যিক অর্থকে বাতিল করে দিয়েছেন এই ভেবে যে তা আল্লাহর জন্য উপযোগী নয়। আর এটাই হলো তাশবীহ তথা সাদৃশ্যকরণ। তারা তাশবীহনির্ভর অর্থকেই বহাল রেখেছেন। এ দলটিই হলো মুশাব্বিহাদের দল। এদের মতামত কয়েক কারণে বাতিল ও হারাম:

প্রথমত: এটা সিফাত-বিষয়ক টেক্সটসমূহের বিরুদ্ধে অন্যায় এবং তার যে অর্থ রয়েছে সেটাকে নাকচ করে দেওয়া। এটা কি করে বলা সঙ্গত যে এ

টেক্সটসমূহকে বাহ্যিক অর্থের ওপর বহন করলে তা তাশবীহ হয়ে যায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ [الشورى: ١١]

তাঁর মত কিছু নেই। *(সূরা আশ-শূরা: ৪২: ১১)*

অর্থাৎ যারা এ টেক্সটসমূহের বাহ্যিক অর্থ বাতিল করে দেন তারা এই মনে করে বাতিল করে দেন যে বাহ্যিক অর্থগুলো সৃষ্টিজীবের সিফাতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাদের এ ধারণাটিই হলো মূলত তাশবীহ; কেননা আল্লাহর সিফাতের সঙ্গে সৃষ্টিজীবের সিফাতের আদৌ কোনো তুলনা হয় না। তারাই বরং এ ধরণের অযাচিত তুলনার আশ্রয় নেয়।

দ্বিতীয়ত: আকল-বুদ্ধি দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে সৃষ্টিকর্তা সত্তাগত এবং গুণগতভাবে সর্বদিক থেকেই সৃষ্টিজীব হতে সম্পূর্ণ আলাদা। অতএব সৃষ্টিকর্তার সিফাত সৃষ্টিজীবের সিফাতের সমতুল্য হবে এটা কিভাবে কল্পনা করা যায়?

তৃতীয়ত: মুশাব্বিহ বা 'সাদৃশ্য স্থাপনকারী ব্যক্তি' সিফাত-বিষয়ক টেক্সটসমূহ থেকে যা বুঝেছে তা সালাফ তথা উত্তম পূর্বপুরুষদের বুঝ থেকে ভিন্ন। অতএব তা বাতিল।

[একটি সন্দেহ ও তার উত্তর]

আর যদি মুশাব্বিহ তথা সাদৃশ্যস্থাপনকারী ব্যক্তি বলে: আমি আল্লাহ তা‘আলার অবতরণ, আল্লাহ তা‘আলার হাত ইত্যাদির দ্বারা তা-ই বুঝি যা সৃষ্টিজীবের রয়েছে; কেননা আল্লাহ তা‘আলা আমাদের বোধগম্য ভাষাতেই তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন, তবে এর উত্তর তিনভাবে দেওয়া যায়:

প্রথমত: যিনি বাণী পাঠিয়েছেন স্বয়ং তিনিই নিজ সম্পর্কে বলেছেন:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ [الشورى: ١١]

তাঁর মত কিছু নেই। *(সূরা আশ্‌শুরা: ৪২: ১১)*

অন্যত্র বলেছেন:

﴿ فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٧٤ ﴾ [النحل: ٧٤]

সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য অন্যকোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না। *(সূরা আন্- নাহল: ১৬: ৭৪)*

তিনি অন্য এক আয়াতে বলেন:

﴿فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢ ﴾ [البقرة: ٢٢]

> সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। *(সূরা আল বাকারা: ২: ২২)*

আর আল্লাহ তা'আলার সকল কথাই সত্য এবং একটি অন্যটিকে সমর্থন করে। অতএব এ ক্ষেত্রে কোনো বৈপরিত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত: সাদৃশ্যস্থাপনকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে: তুমি কি বুঝতে পার না যে আল্লাহ তা'আলার একটি সত্তা রয়েছে যা অন্যান্য সত্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়? উত্তরে সে বলবে, হ্যাঁ, বুঝতে পারি। এবার তাকে বলা হবে, তাহলে তুমি এটা কেন বুঝবে না যে আল্লাহ তা'আলার সিফাত রয়েছে যা অন্যসব সিফাত থেকে ভিন্ন। কারণ সত্তার ব্যাপারে যা প্রযোজ্য তা সিফাতেরও ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আর যে ব্যক্তি সত্তা ও সিফাতের মধ্যে পার্থক্য করল সে বৈপরীত্যের আশ্রয় নিল।

তৃতীয়ত: সাদৃশ্যস্থাপনকারী ব্যক্তিকে বলা হবে, তুমি কি দেখ না যে মাখলুকাতের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যার নাম অভিন্ন কিন্তু প্রকৃতি ও আকার-ধরনের বিবেচনায় একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন? সে বলবে, হ্যাঁ দেখি। এরপর তাকে বলা হবে যদি তুমি মাখলুকাতের মধ্যে এ পার্থক্য মেনে নাও, তবে খালিক ও মাখলুকের মধ্যে পার্থক্য কেন মেনে নাও না। অথচ খালিক ও মাখলুকের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। বরং খালিক ও মাখলুকের মধ্যে সাদৃশতা একটি অসম্ভব ব্যাপার। সিফাত-

বিষয়ক ষষ্ঠ মূলনীতিতে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় দল: যারা বলে যে সিফাত-বিষয়ক টেক্সটসমূহের বাহ্যিক অর্থ বাতিল এবং তা আল্লাহর জন্য উপযোগী নয়। বরং তা হলো তাশবীহ বা সাদৃশ্য স্থাপন। এরপর তারা বাহ্যিক অর্থকে আল্লাহর জন্য উপযোগী পদ্ধতিতে মেনে নেয়াকেও অস্বীকার করেন। এরা হলো আহলে তা'তীল অর্থাৎ অর্থশূণ্যকারী সম্প্রদায়। তাদের এই অর্থশূণ্যকরণ প্রক্রিয়া নাম ও সিফাত উভয় ক্ষেত্রেই অথবা শুধু সিফাতের ক্ষেত্রে অথবা নাম ও সিফাত এ দুয়ের মধ্যে যেকোনো একটির ক্ষেত্রে সেটা তারা করে থাকে। তারা নাম ও সিফাত সংবলিত এ টেক্সটসমূহের বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে এসে নিজদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী সেগুলোর অর্থ নির্ধারণ করেছে। তবে তারা এ অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করেছে। তারা এটার নাম দিয়েছে তা'বিল বা ব্যাখ্যা, কিন্তু আসলে তা তাহরীফ বা বিকৃতি।

তাদের এ মতামত কয়েক কারণে বাতিল:

প্রথমত: এটা আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণীর বিপক্ষে স্পর্ধা প্রদর্শন; কারণ তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বাণীর এমন অর্থ করেছে যা বাতিল এবং আল্লাহর জন্য অনুপযোগী, বরং আল্লাহর উদ্দেশের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত: এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাকে তার

বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, অথচ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্পষ্ট আরবী ভাষায় খেতাব করেছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর কালামকে আরবী ভাষার দাবি অনুযায়ী বুঝতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলেছেন; অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীকে আরবী ভাষার বাহ্যিক অর্থ ও দাবি অনুযায়ী বুঝতে হবে। তবে আল্লাহর (সত্ত্বা, নাম ও গুণের) ক্ষেত্রে সে অর্থের আকার-প্রকৃতি, ধরণ ও তুলনা নির্ধারণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

তৃতীয়ত: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাকে বাহ্যিক অর্থে না নিয়ে এমন অর্থে নেওয়া যা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত, নিশ্চয় একটি হারাম কাজ এবং অজ্ঞতাবশত আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলা যা তিনি বলেন নি। বিষয়টি যে হারাম তা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়:

﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٣ ﴾ [الاعراف: ٣٣]

বল, 'আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের

শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না’। (সূরা আল আরাফ: ৭: ৩৩)

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ۝٣٦ ﴾ [الاسراء: ٣٦]

“আর যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই সেটার অনুসরণ করো না, নিশ্চয় কান, চোখ এবং অন্তর এসব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” (সূরা আল ইসরা: ১৭: ৩৬)

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথাকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে বিপরীত কোনো অর্থে ব্যবহার করল সে এমন বিষয়ের অনুসরণ করল যার ব্যাপারে তার কোনো ইলম নেই এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলল যার ব্যাপারে তার কোনো জ্ঞান নেই; কারণ:

এক. সে ধারণা করল যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর উদ্দেশ্য এরকম নয়, অথচ এরকমটাই বাণীর বাহ্যিক অর্থ।

দুই. সে ধারণা করল যে বাণীর উদ্দেশ্য অন্যটা; যা বাহ্যত বাণী থেকে বুঝা যাচ্ছে না।

আর এটা আমাদের জানা যে, আল কুরআনের কোনো শব্দের যদি দুটি অর্থ থাকে এবং উভয়টিই সমান সম্ভাবনাময় হয়, তাহলে এই দুই অর্থের মধ্যে একটিকে নির্ধারণ করে দেওয়া বৈধ নয়; কেননা এতে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর ওপর এমন কথা বলা হবে যা তিনি বলেননি। বিষয়টি যদি এমনই স্পর্শকাতর হয়ে থাকে, তাহলে আপনিই বলুন, যদি কেউ বাহ্যিক অর্থ বর্জন করে এমন অনগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অর্থকে নির্ধারিত করে দেয় যা তার বিপরীত, তাহলে সে কি ধরনের অন্যায়ের আশ্রয় নেয়?

এর উদাহরণ: ইবলীসকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ قَالَ يَـٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ ﴾ [ص: ٧٥]

> আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস, আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? *(সূরা সাদ: ৩৮: ৭৫)*

এই আয়াতের অর্থ নির্ধারণে যদি কেউ বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে গিয়ে বলে যে, এখানে দু'হাত বলতে মূলত হাত বুঝানো হয়নি বরং এখানে হাত দ্বারা বুঝানো হয়েছে এই এই। তাহলে এই ব্যক্তিকে বলব যে আপনি যে বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করে দিলেন এর পক্ষে আপনার দলিল কি? আর যে

অর্থকে আপনি প্রমাণ করলেন তার সপক্ষে প্রমাণ কি? সে যদি দলিল নিয়ে আসতে পারে তো ভালো, কিন্তু সে দলিল পাবে কোথায়। অতএব সে যা নাকচ করল এবং যা প্রমাণ করল উভয় ক্ষেত্রেই সে ইলম ব্যতীত আল্লাহর ওপর এমন কথা বলল যা আল্লাহ তা'আলা বলেননি।

চতুর্থত: আহলে তা'তীল তথা 'আল্লাহর নাম ও গুণের ভাষ্যসমূহকে অর্থশূণ্যকারী' সম্প্রদায়ের কথা এজন্যও প্রত্যাখ্যাত যে সিফাত-বিষয়ক টেক্সটসমূহকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, এ উম্মতের উত্তম পূর্বপুরুষ ও ইমামগণ যার ওপর ছিলেন তার বিরুদ্ধে যাওয়া। অতএব তা বাতিল। কেননা হক ও সত্য তো নিঃসন্দেহে তাই যার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, এ উম্মতের উত্তম পূর্বপুরুষ ও ইমামগণ ছিলেন।

পঞ্চমত: এ ধরনের ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে বলা হবে, আল্লাহ তা'আলা নিজ সম্পর্কে যতটুকু জানেন তুমি কি তার থেকেও বেশি জান? সে নিশ্চয় উত্তরে বলবে যে না, জানি না।

এবার তাকে প্রশ্ন করে বলা হবে: আল্লাহ তা'আলা নিজ সম্পর্কে যা জানিয়েছেন তা কি হক ও সত্য? সে নিশ্চয় উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, হক ও সত্য।

এরপর তাকে বলা হবে: আল্লাহ তা‘আলার বাণী যে বিশুদ্ধতম ও স্পষ্টতম বাণী, তা কি তুমি বিশ্বাস কর? সে অবশ্যই বলবে, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি।

এরপর তাকে বলা হবে: তাহলে তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ তা‘আলা এই টেক্সটসমূহের অর্থ কি তা অস্পষ্ট আকারে রেখে দেবেন যাতে মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেচনা ব্যবহার করে তা উদ্ধার করে নেয়। উত্তরে সে অবশ্যই বলবে: না।

এ গেল আল-কুরআনের টেক্সটসমূহের কথা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় সিফাত-বিষয়ক যেসব টেক্সট এসেছে তার ব্যাপারে একই ধরনের প্রশ্ন করা যায়। অতঃপর বলা যায় যে: তুমি কি আল্লাহর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও অধিক জান? সে বলবে, না, জানিনা।

এরপর তাকে বলা হবে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সম্পর্কে যা বলেছেন তা কি হক ও সত্য? সে বলবে, হ্যাঁ, হক ও সত্য।

এরপর তাকে বলা হবে: তুমি কি এমন কাউকে জান যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষী? উত্তরে সে অবশ্যই বলবে, না।

এরপর তাকে বলা হবে: তুমি কি এমন কাউকে জান যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে উম্মতের জন্য অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী? সে অবশ্যই বলবে, না।

এরপর তাকে বলা হবে: যদি তুমি উল্লিখিত কথাগুলো স্বীকার করে নাও, তাহলে কেন তোমার যথেষ্ট সাহস হয় না যে তুমি আল্লাহর জন্য ঠিক তা সাব্যস্ত করবে যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, প্রকৃত ও আল্লাহর জন্য উপযোগী বাহ্যিক অর্থ হিসেবে। অথচ দেখা যায় যে প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থ নাকচ করে দেওয়া এবং এর স্থলে বিপরীত অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রে তুমি বাহাদুরী দেখাও।

এতে তোমার কি ক্ষতি যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য তাঁর কিতাবে যা সাব্যস্ত করেছেন তুমিও তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করবে। অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাতে আল্লাহর জন্য উপযোগীভাবে যা সাব্যস্ত করেছেন তুমিও তা সাব্যস্ত করবে। অতএব কুরআন-সুন্নায় সাব্যস্ত করা ও অসাব্যস্ত করার বিষয়ে যা কিছু এসেছে তুমি তা মেনে নেবে। এটাইকি তোমার জন্য সঠিক ও নিরাপদ নয়? কারণ তোমাকে তো কিয়ামতের ময়দানেই জিজ্ঞাসা করা হবে:

﴿مَاذَآ أَجَبۡتُمُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ٦٥﴾ [القصص: ٦٥]

‘তোমরা রাসূলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে?’ *(সূরা আল কাসাস: ২৮: ৬৫)*

তুমি যদি সিফাত-বিষয়ক বাণীসমূহকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নিয়ে তার অন্যকোনো অর্থ কর, এটা কি তোমার জন্য বিপদের কারণ হবে না, কেননা হতে পারে যে তুমি যে অর্থ করেছ সেটা উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো অন্যটা।

ষষ্ঠত: আহলে তা‘তীল তথা আল্লাহর নাম ও গুণের ভাষ্যসমূহকে অর্থশূণ্যকারীদের কথা এজন্যও অগ্রহণযোগ্য যে তা মেনে নিলে কিছু অযাচিত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অতএব তা বাতিল। যেমন:

এক. আহলে তা‘তীল: সিফাত-বিষয়ক টেক্সটসমূহকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে এ জন্যে সরিয়ে নেয় যে তারা মনে করে থাকে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ এ অনুভূতি দেয় অথবা এ দাবি করে যে আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিজীব সদৃশ। অথচ আল্লাহ তা‘আলাকে সৃষ্টিজীব সদৃশ মনে করা কুফরি; কেননা তাতে আল কুরআনের ওই আয়াতকে অস্বীকার করা হয় যেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ﴾ [الشورى: ١١]

‘তাঁর মত কিছু নেই।’ *(সূরা আশ-শূরা: ৪২: ১১)*

নু‘আইম ইবনে হাম্মাদ আল-খুযা‘ঈ, যিনি ইমাম বুখারী র. এর একজন উস্তাদ ছিলেন, তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করল সে কাফের হয়ে গেল। আর আল্লাহ তা‘আলা নিজকে যেভাবে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁর রাসূল তাঁকে যেভাবে গুণান্বিত করেছেন তাতে কোনো তাশবীহ তথা সাদৃশ্যকরণ নেই।’

আর এটা স্পষ্ট যে সবচেয়ে বড় বাতিল বিষয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বাহ্যিক অর্থকে এমন মনে করা যে তাতে সৃষ্টিজীবের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া বাধ্য করে এবং তাতে কুফরি হওয়া আবশ্যক হয়ে যায় অথবা সেটাতে নিপতিত হওয়ার সন্দেহে পড়তে হয়।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তা‘আলার কিতাব যা তিনি নাযিল করেছেন সকল বিষয়ের বর্ণনা হিসেবে, মানুষের জন্য হিদায়েত হিসেবে, অন্তরে থাকা সকল ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রস্ফুটিত আলো হিসেবে, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে, সে কিতাবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাম ও সিফাত সম্পর্কে কি ধরনের বিশ্বাস পোষণ করতে হবে তা স্পষ্টভাবে বলে দেবেন না বরং বিষয়টি মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেবেন যে, তারা যা ইচ্ছা তা সাব্যস্ত করবে এবং যা ইচ্ছা তা অসাব্যস্ত করবে, এটা কি করে

সম্ভব! অতএব এ ধরনের বিশ্বাসই বরং বাতিল।

তৃতীয়ত: আহলে তা'তীলের কথা মেনে নিলে বলতে হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদা, সাহাবায়ে কেরাম, সালাফগণ এবং আয়েম্মায়ে কিরাম মহান আল্লাহর সিফাত-বিষয়ে যা জানার প্রয়োজন ছিল তা জানা এবং প্রচার করার ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন; কেননা আহলে তা'তীল 'তাবিল' এর নামে যেসব কথা বলেছেন এসব কথার একটি অক্ষরও তাঁরা বলেননি।

অতএব হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদা, সাহাবায়ে কেরাম, সালাফগণ এবং আয়েম্মায়ে কিরাম সিফাত-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জন বিষয়ে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন অথবা উম্মতের উদ্দেশে তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। আর উভয় কথাই বাতিল।

চতুর্থত: আহলে তা'তীলের কথা মেনে নিলে বলতে হয় যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা সাব্যস্ত করেছেন তা নাকচ করে দেওয়া বৈধ। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢]

(এবং তোমার রব আসবেন।' *(সূরা: আল ফাজর: ৮৯: ২২'*

সেখানে বলা শুদ্ধ হবে যে, না, আল্লাহ তা'আলা আসবেন না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন যে,

«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»

‘’আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতেই নিম্নাকাশে অবতরণ করেন‘

সেখানে বলা শুদ্ধ হবে যে, না, আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন না। কারণ তারা উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে বলেন যে এখানে ‘আসা’ এবং ‘অবতরণ’ করাকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা রূপক অর্থে, প্রকৃত অর্থে নয়। অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে এখানে অর্থ হবে, ‘আল্লাহর নির্দেশ আসা’। রূপক অর্থের বড় আলামত হলো প্রকৃত অর্থকে নাকচ করে দেওয়া শুদ্ধ হওয়া। আর আল্লাহ এবং তার রাসূল যা সাব্যস্ত করেছেন তা নাকচ করে দেওয়া জঘন্যতম বাতিল বিষয়। অন্যকোনো অর্থে তাবিল করার দ্বারা এ বাতুলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না; কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর কনটেক্সটে এমন কোনো ইশারা নেই যার দ্বারা বুঝা যাবে যে এখানে অর্থ হলো ‘নির্দেশ আসা’।

[সিফাত বিষয়ে আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়ের মতবাদের খণ্ডন]

আহলে তা'তীলের কেউ কেউ আল্লাহ তা'আলার সকল সিফাতের ক্ষেত্রে এই রূপক অর্থ নেওয়ার নীতি অনুসরণ করে, অথবা তারা আল্লাহর

নামসমূহকেও এ নীতির আওতায় শামিল করে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা ভিন্ন পথ ধরেন অর্থাৎ কিছু সিফাতকে সাব্যস্ত করেন আবার কিছু সিফাতকে অসাব্যস্ত করেন। যেমন আশ‘আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায়। তাদের বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে যেটি বোধগম্য মনে হয়েছে সেটি তারা সাব্যস্ত করে, আবার যেটি তাদের কাছে অবোধ্যগম্য মনে হয়েছে তা তারা নাকচ করে দিয়েছে।

তাদের জন্য আমাদের বক্তব্য হলো: আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার বোধগম্যতার নিরিখে যা নাকচ করে দিয়েছেন, তা বুদ্ধি-বিবেচনার দলিল দিয়েই প্রমাণ করা যায়, পাশাপাশি ওহীর প্রমাণ তো আছেই।

এর উদাহরণ: তারা ‘ইরাদাহ’ অর্থাৎ ‘ইচ্ছা’র সিফাতকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেন। পক্ষান্তরে ‘রহমত’ অর্থাৎ ‘করুণা’র সিফাতকে নাকচ করে দেন। ‘ইচ্ছা’র সিফাতকে তারা ওহী ও যুক্তি এ উভয়টির আলোকে সাব্যস্ত করেন। তন্মধ্যে

ওহী থেকে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো, আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾ [البقرة: ٢٥٣]

কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা করেন। *(সূরা আল*

বাকারা: ২: ২৫৩)

পক্ষান্তরে সেটা সাব্যস্ত করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে যুক্তির দলিল হলো: সৃষ্টিকুলের বিভিন্নতা এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে আলাদা সত্তা ও গুণ প্রদান করা এ কথারই প্রমাণ যে আল্লাহ তা'আলা 'ইচ্ছা'র গুণে গুণান্বিত।

কিন্তু তারা আল্লাহর জন্য রহমত বা 'করুণা'র গুণকে এ যুক্তিতে নাকচ করে দিয়েছে যে, করুণা করার দাবি হলো, যার প্রতি করুণা করা হবে তার জন্য করুণাকারী নরম হয়ে যাবেন। আর এই নরম হয়ে যাওয়া আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব, অকল্পনীয় বিষয়। [সুতরাং তাদের মতে রহমত গুণ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না]

এরপর তারা যেসব আয়াত ও হাদীসে রহমতের কথা আছে সেসব আয়াত ও হাদীসকে তাবিল তথা অপব্যাখ্যা করে বলেন যে এখানে রহমতের অর্থ 'কর্ম' অথবা 'কর্ম' করার ইচ্ছা। অতএব তারা الرحيم (আর রাহীম) শব্দের অর্থ করেন, 'নিয়ামতদাতা', অথবা 'নিয়ামত প্রদানের ইচ্ছাকারী'।

এদের জন্য আমাদের বক্তব্য হলো: 'রহমত' গুণটি আল্লাহ তা'আলার জন্য ওহী দ্বারা প্রমাণিত। আর সংখ্যা ও ধরনের বিবেচনায় রহমত গুণটি যতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, 'ইচ্ছা' সিফাতটি ততভাবে সাব্যস্ত হয়নি। তা নাম হিসেবে এসেছে, যেমন:

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ ﴾ [الفاتحة: ٣]

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। *(আল ফাতিহা: ৩)*

সিফাত হিসেবে এসেছে, যেমন:

﴿ وَرَبُّكَ ٱلۡغَفُورُ ذُو ٱلرَّحۡمَةِۖ﴾ [الكهف: ٥٨]

আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। *(আল কাহফ: ১৮: ৫৮)*

এবং ক্রিয়াপদ হিসেবে এসেছে। যেমন:

﴿وَيَرۡحَمُ مَن يَشَآءُۖ﴾ [العنكبوت: ٢١]

এবং যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন। *(আল আনকাবুত: ২৯: ২১)*

এর পাশাপাশি রহমত সিফাতটি যুক্তির মাধ্যমেও প্রমাণ করা যায়। আর তা এভাবে যে, বান্দাদের ওপর আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামতসমূহ অনবরত বর্ষিত হওয়া এবং তাদের ওপর থেকে আপদ-বিপদ উঠিয়ে নেওয়া এ কথার প্রমাণ যে আল্লাহ তা‘আলা রহমতের গুণে গুণান্বিত। আর এ নিয়ামত বর্ষিত হওয়া এবং বিপদ উঠে যাওয়ার বিষয়টি ইচ্ছার গুণের তুলনায় রহমতের গুণকে অধিক পরিষ্কারভাবে বুঝায়; কেননা এ বিষয়টি

সাধারন মানুষ ও জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সবার কাছেই স্পষ্ট। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি কেবল বিশেষ ব্যক্তিদের কাছেই পরিষ্কার।

আর রহমত গুণটিকে এই অজুহাতে নাকচ করে দেওয়া যে, তা মেনে নিলে বলতে বাধ্য হতে হয় যে, যিনি রহমকারী তিনি নরম হয়ে যান, অতএব তা আল্লাহর ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। এ কথার জবাব হলো: যদি উল্লিখিত কারণে 'রহমত' সিফাতকে নাকচ করে দেওয়া হয়, তবে অভিন্ন কারণে 'ইচ্ছা' সিফাতকেও নাকচ করে দেওয়া যাবে; কেননা ইচ্ছা বলা হয়, এমন বিষয়ের প্রতি ইচ্ছাকারীর ঝুঁকে পড়া যার দ্বারা সে কোনো উপকারসাধন অথবা ক্ষতিকর বিষয়কে দমন করতে চান। অতএব 'ইচ্ছা'র দাবি হলো প্রয়োজনগ্রস্ত থাকা। আর আল্লাহ তা'আলা সকল প্রয়োজন থেকে পবিত্র।

উত্তরে যদি বলা হয়: আপনি 'ইচ্ছা'র যে সংজ্ঞা দিলেন তাতো হলো সৃষ্টিজীবের ইচ্ছার সংজ্ঞা, তাহলে বলব যে রহমতের ব্যাপারে আপনারা যা বলেন, সেটাও তো সৃষ্টিজীবের রহমতের বর্ণনা। সৃষ্টিকর্তার রহমত তো সম্পূর্ণ ভিন্ন, যার হাকীকত মানুষের জানা নেই।

এই আলোচনা দ্বারা আহলে তা'তীল তথা সিফাত-বাতিলকারী সম্প্রদায়ের সকল বক্তব্যই খণ্ডিত হয়ে গেল, হোক সাধারণ তা'তীল অথবা বিশেষ

তা'তীল।

অতএব এটা এখন স্পষ্ট যে আশ'আরী ও মাতুরিদী সম্প্রদায় আল্লাহর (যে সব) নাম ও সিফাত (সাব্যস্ত করে তা) সাব্যস্ত করতে গিয়ে মুতাযিলা ও জাহমিয়া সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডনের ক্ষেত্রে যা বলেন তা দিয়ে আসলে তাদের যুক্তি খণ্ডিত হয় না। আর তা দু কারণে:

এক. মুতাযিলা ও জাহমিয়া সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে যে পথে গমন করা হলো, সেটা হলো বিদ'আতী পথ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সালাফ ও ইমামগণ এ পথের ওপর ছিলেন না। আর মুতাযিলা ও জাহমিয়াদের বিদআতকে অপর বিদআত দিয়ে দমন সমুচিত নয়, বরং বিদআতকে সুন্নত দিয়ে দমন করতে হয়।

দ্বিতীয়ত: মুতাযিলা ও জাহামিয়া সম্প্রদায় অভিন্ন ধরনের যুক্তির আশ্রয় নিয়ে আশ'আরী ও মাতুরিদীদের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারে যে যুক্তির আশ্রয় নিয়ে আশ'আরী ও মাতুরিদীরা আহলে সুন্নাতের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছে। তারা বলতে পারে যে: আপনারা যুক্তিভিত্তিক দলিলের আশ্রয় নিয়ে সিফাত নাকচ করাকে নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছেন এবং ওহীর দলিল দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তা আপনার তাবিল করেছেন। তাহলে আমরা যুক্তিভিত্তিক দলিলের আশ্রয়ে যা নাকচ করলাম এবং ওহীর দলিলকে যেভাবে তাবিল করলাম তা আমাদের ক্ষেত্রে অবৈধ ভাবার কারণ

কি? আপনারও বুদ্ধিনির্ভর যুক্তি দেন আমরাও বুদ্ধিনির্ভর যুক্তি দিই। তাহলে আমাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ এবং আপনাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হওয়ার কারণ কি? অতএব আমাদের কথা অস্বীকার করার জন্য স্রেফ মনোবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া আপনাদের কাছে কোনো প্রমাণই দেখছি না।

এটি একটি অকাট্য যুক্তি এবং জাহমিয়া ও মুতাযিলাদের পক্ষ থেকে আশ'আরী ও মাতুরিদীদের বাকরুদ্ধ করার মতো প্রমাণ। এ যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডানোর একটিই পথ, আর তা হলো সালাফদের মাযহাব যারা এ পথকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন এবং আল্লাহর জন্য ওইসব নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করেন যা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন। যে সাব্যস্তকরণ প্রক্রিয়ায় নেই কোনো তুলনা নির্ধারণ অথবা আকার-প্রকৃতি নির্ধারণ আর না আছে কোনো অর্থশূণ্যকরণ অথবা বিকৃতিসাধন। আসলে আল্লাহ তা'আলা যদি কারো জন্যে আলোর ব্যবস্থা না করেন তাহলে নিজ থেকে কেউ আলোর ব্যবস্থা করতে পারেন না। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ۝٤٠﴾ [النور: ٤٠]

আর আল্লাহ যাকে নূর দেন না তার জন্য কোনো নূর নেই। *(সূরা আন-নূর: ২৪: ৪০)*

দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে,

প্রত্যেক মু‘আত্তিল (সিফাতের বাহ্যিক অর্থ বাতিলকারী) ব্যক্তিই ‘মুমাচ্ছিল’ (অর্থাৎ সৃষ্টিজীবের সিফাতের সঙ্গে আল্লাহ তা‘আলার সিফাতকে তুলনাকারী) অনুরূপভাবে প্রত্যেক মুমাচ্ছিল (সৃষ্টিজীবের গুণাগুণের সঙ্গে আল্লাহর গুণাগুণের তুলনাকারী) ব্যক্তিই মু‘আত্তিল (সিফাতকে অর্থহীনকারী)।

তন্মধ্যে মু‘আত্তিল (সিফাতকে অর্থশূণ্যকারী) কিভাবে তা তা‘তীল (অর্থহীন) করে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট। এখন থেকে যায় মু‘আত্তিল (সিফাতের বাহ্যিক অর্থ বাতিলকারী ব্যক্তি) কিভাবে মুমাচ্ছিল (আল্লাহর সিফাতকে সৃষ্টিজীবের সিফাতের সঙ্গে তুলনাকারী) সেটা প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে বলা যায় যে, সিফাতকে অর্থহীনকারী এ জন্যই তা অর্থহীন করে যে তার ধারণা মতে, বাহ্যিক অর্থ রেখে দিলে আল্লাহর সিফাত সৃষ্টিজীবের সিফাততুল্য হয়ে যায়, এ কারণেই সে তা অর্থহীন করে দেয়। অতএব সে প্রথমে সৃষ্টিজীবের সঙ্গে তুলনা করছে এবং পরে বাতিলকরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিচ্ছে।

এবার আসা যাক মুমাচ্ছিল (আল্লাহ তা‘আলার সিফাতকে সৃষ্টিজীবের সিফাতের সঙ্গে তুলনাকারী) এর প্রসঙ্গে। তুলনাকারী একদিকে সে তুলনাকারী অপরদিকে সে সেগুলোকে অর্থহীন ধারণাকারী। বস্তুত সে তিন

কারণে এগুলোকে অর্থহীনকারী হিসেবে পরিণত হয়েছে:

এক. সে খোদ ওই টেক্সটকেই অর্থহীন করে দিয়েছে যার দ্বারা সিফাত প্রমাণ করা হয়। কেননা সে এ টেক্সটকে এমনভাবে বুঝেছে যার দ্বারা সৃষ্টিজীবের সঙ্গে আল্লাহর তা'আলার তুলনা হয়ে যায়। যদিও এ টেক্সটে আদৌ কোনো তুলনা নেই; কেননা তা আল্লাহ তা'আলার সিফাতকে এমনভাবে সাব্যস্ত করছে যেমনভাবে তা আল্লাহর জন্য উপযোগী।

দুই. সে প্রত্যেক ওই টেক্সটকে অন্তঃসারশূণ্য করে দিয়েছে যার দ্বারা সৃষ্টিজীবের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার তুলনাহীনতা প্রমাণিত হয়।

তিন. সে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যথাযথ ওয়াজিব পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী থেকে বিমুক্ত করে দিয়েছে, কারণ, সে অপূর্ণাঙ্গ মাখলুকের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলাকে তুলনা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর গুণাগুণ সাব্যস্তকারী আহলে সুন্নাতের উপর আরোপিত বাতিলপন্থীদের কিছু সন্দেহ ও তার জওয়াব

যারা সিফাতসমূহকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে তাবিল তথা দূর ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয় তাদের মধ্যে একদল আছে এমন যারা কুরআন-সুন্নাহয় সিফাত-বিষয়ক কিছু টেক্সট সম্পর্কে আহেল সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাদের দাবি এই যে আহলে সুন্নাত এই টেক্সটসমূহকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থে নিয়ে থাকেন। তাদের এ প্রশ্ন উত্থাপনের মূল লক্ষ্য আহলে সুন্নাতকে তাবিলপন্থীদের দলে শামিল করে নেওয়া এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে ও তাদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই তা প্রমাণ করা।

যারা এরূপ প্রশ্ন করেন, দু পর্যায়ে তাদের উত্তর দিতে চাই। প্রথম পর্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে:

প্রথমত: সংক্ষিপ্ত জবাব আর তা দুভাবে:

এক. আমরা এটা মানি না যে আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা সিফাত বিষয়ক কিছু টেক্সটকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়; কারণ বাহ্যিক অর্থ বলতে বুঝায় কোনো কথা সামনে আসামাত্র যে অর্থটি মাথায় উঁকি দেয়। আর এ বাহ্যিক অর্থ কথার কনটেক্সট হিসেবে, কথাকে যার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করা হয় তার হিসেবে, ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পাশাপাশি বাক্যের গাঁথুনি হিসেবেও শব্দার্থের পরিবর্তন হয়। আর একটি বাণী তো কিছু শব্দ ও বাক্যের সমন্বয়েই তৈরি হয়। অতএব একটিকে অন্যটির সঙ্গে মেলানোর পরই অর্থ উদ্ধার হয়।

দুই. যদি আমরা মেনেও নিই যে আহলে সুন্নাত যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা কিছু টেক্সটকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়, তবে তারা এরূপ করেছেন কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে। হয়তো টেক্সটের সঙ্গেই থাকা দলিল অথবা অন্য কোথাও থাকা দলিল। তারা নিছক কিছু সংশয়-সন্দেহকে দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেননি, অথচ এসব সংশয়-সন্দেহকেই আহলে তা‘তীল অকাট্য প্রমাণ হিসেবে মনে করে এবং আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করে যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেননি।

দ্বিতীয়ত: বিস্তারিত জবাব

এ পর্যায়ে ওইসব টেক্সট সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলোর ব্যাপারে বলা

হয় যে আহলে সুন্নাত তা বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। নিম্নবর্ণিত উদাহরণগুলো থেকে তা বুঝা যাবে। তাহলে ইমাম গাযালীর একটি কথা উল্লেখের মাধ্যমে শুরু করি। ইমাম গাযালী হাম্বলী মাযহাবের কোনো ব্যক্তির বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, 'ইমাম আহমদ তিন জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও তাবিল করেননি। এ তিন জায়গা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনটি হাদীস:

الحجر الأسود يمين الله في الأرض

হজরে আসওয়াদ জমীনের বুকে আল্লাহর ডান হাত

قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن

বান্দাদের অন্তরসমূহ দয়াময়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'আঙ্গুলের মাঝখানে।

إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن

নিশ্চয় আমি আল্লাহর (বান্দাদের) নাফস (বিপদমুক্তির বিষয়টি) ইয়েমেনবাসীদের দিকে পাই।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদীসগুলো ইমাম গাযালী

থেকে বর্ণনা করে মাজমুউল ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেছেন। *(খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৯৮)*

এরপর তিনি বলেছেন, ‘এ ঘটনাটি ইমাম আহমদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার’।

প্রথম উদাহরণ: ‘হজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত’।

এর উত্তর: উক্ত হাদীসটি বাতিল হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উক্ত হাদীসটি প্রমাণিত হয়নি। ইমাম ইবনুল জাওযী ‘আল ইলাল আল মুতানাহিয়া’ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ‘এ হাদীসটি সহীহ নয়’। ইবনুল আরাবী বলেন, ‘এটি একটি বাতিল হাদীস, যার প্রতি তাকানো হবে না।’ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ‘এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপ্রমাণিত সনদে বর্ণিত হয়েছে।’ অতএব এ হাদীসের অর্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। তবু শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: ‘এটা প্রসিদ্ধ যে উক্ত হাদীস ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর পুরো হাদীসটি হলো এ রকম:

«الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله، فكأنما صافح الله وقبل يمينه»

> হজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলার ডান হাত। যে তার সঙ্গে হাত মেলাল এবং চুম্বন করল, সে যেন আল্লাহর সঙ্গে মুসাফাহা করল এবং তাঁর ডান হাত চুম্বন করল।

যে ব্যক্তি উক্ত হাদীসের শব্দমালায় গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করবে সে বুঝতে পারবে এর শব্দমালায় কোনো সমস্যা নেই; কেননা এতে বলা হয়েছে, ‘পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত’। অর্থাৎ এখানে শব্দকে বন্ধনযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে, উন্মুক্তভাবে বলা হয়নি যে, ‘আল্লাহর ডান হাত’ বরং বলা হয়েছে, ‘পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত’। আর কোনো শব্দকে উন্মুক্তভাবে উল্লেখ করা ও বন্ধনযুক্ত করে উল্লেখ করার মধ্যে অর্থগতভাবে পার্থক্য রয়েছে। এরপর তিনি বলেন: ‘যে তার সঙ্গে হাত মেলাল ও মুসাফাহা করল সে যেন আল্লাহর সঙ্গেই মুসাফাহা করল। অতএব হাদীসটি শুরুর অংশ এবং শেষের অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হজরে আসওয়াদ আল্লাহ তা‘আলার সিফাতের মধ্যে শামিল নয়। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যই এ বিষয়টি পরিষ্কার। *(মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৯৮)*

দ্বিতীয় উদাহরণ: ‘বান্দাদের অন্তরসমূহ দয়াময়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্য থেকে দু‘আঙ্গুলের মাঝখানে’।

এর উত্তর: এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি তার গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»

নিশ্চয় আদম সন্তানের সকল অন্তর দয়াময়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'আঙ্গুলের মাঝখানে, এক অন্তরের মতো যা তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«اللّٰهُمَّ مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك»

হে আল্লাহ, অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী! আপনি আমাদের অন্তরসমূহ আপনার আনুগত্যের ওপর স্থির করুন।

আহলে সুন্নাত এবং সালাফগণ হাদীসটিকে বাহ্যিক অর্থেই নিয়েছেন। তারা বলেছেন, প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল আছে একথা আমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার দু'আঙ্গুলের মাঝখানে বান্দাদের অন্তর থাকে একথার দাবি এটা নয় যে আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল বান্দাদের অন্তরসমূহ স্পর্শ করে আছে। হাদীসের শব্দমালা থেকে স্পর্শ করে থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে অন্য অর্থ নেয়ার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। এর উদাহরণ, যদি কেউ বলে যে মেঘমালা জমিন ও আসমানের মাঝখানে, তাহলে এ বক্তব্যের অর্থ এটা নয় যে মেঘমালা জমীন ও আসমানকে স্পর্শ করে আছে। অনুরূপভাবে যদি বলা হয় যে বদরপ্রান্তর মক্কা ও মদীনার মাঝখানে, তাহলে এর অর্থ এটা নয় যে বদরপ্রান্তর মক্কা ও মদীনাকে স্পর্শ করে আছে। অতএব বান্দাদের সকল অন্তর প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু'আঙ্গুলের মাঝখানে, তবে এ মাঝখানে থাকাটা স্পর্শকে আবশ্যক করে না। না আবশ্যক করে সত্তাগতভাবে বান্দাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সংমিশ্রণকে যাকে আরবীতে 'হুলুল' বলা হয়।

তৃতীয় উদাহরণ: ‘নিশ্চয় আমি আল্লাহর (বান্দাদের) নাফস (বিপদমুক্তি) ইয়েমেনবাসীদের পক্ষ থেকে পাই।’

এর উত্তর: এ হাদীসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৪১)। হাদীসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘ঈমান হলো ইয়েমেনি এবং প্রজ্ঞাও হলো ইয়েমেনি। আর নিশ্চয় আমি আল্লাহর (বান্দাদের) নাফস (বিপদমুক্তি) ইয়েমেনবাসীদের পক্ষ থেকে পাই।’ (হাইসামী) মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে এসেছে, এ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে শাবীব ছাড়া; তিনিও হলেন ছিকাহ অর্থাৎ বিশ্বস্ত। ‘তাকরীব’ গ্রন্থে এসেছে, শাবীব হলেন তৃতীয় তাবাকার বিশ্বস্ত বর্ণনাকরী। ইমাম বুখারী ‘আত-তারীখুল কাবীর’ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গাযালীর কথা অনুযায়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এ হাদীসটিকে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে এর অন্য অর্থ করেছেন। কিন্তু মূল বিষয় সে রকম নয়। কেননা হাদীসটিতে যে نفس শব্দটি এসেছে তার উচ্চারণ হবে ‘নাফাস’ ‘নাফ্স’ নয়। নাফ্স শব্দের অর্থ অন্তর। অতএব নাফ্স বললে হাদীসটির অর্থ দাঁড়াত: ‘আমি দয়াময়ের অন্তরকে ইয়েমেনের দিকে পাই’। কিন্তু এখানে নাফ্স উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো নাফাস। নির্ভরযোগ্য

আরবী আভিধানগ্রন্থ ‘মাকাইসুল্লগাহ’ - তে নাফাস শব্দের অর্থ করা হয়েছে, ‘এমন জিনিস যার মাধ্যমে বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।’ সে হিসেবে হাদীসটি অর্থ দাঁড়াবে, ‘আল্লাহ তা‘আলা ইয়েমেনবাসীদের মাধ্যমে বান্দাদের বিপদমুক্ত করবেন।’

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: ‘এই ইয়েমেনবাসীরাই মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং বিভিন্ন শহর জয় করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের মাধ্যমেই নানা সমস্যা থেকে মুমিনদের উদ্ধার করেছেন। *(মাজমুউল ফাতাওয়া:খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৯৮)*

চতুর্থ উদাহরণ: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ٢٩]

অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোযোগী হলেন। *(আল বাকারা: ২: ২৯)*

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আহলে সুন্নাতের দুটি বক্তব্য রয়েছে:

প্রথম বক্তব্য: এখানে ‘ইস্তাওয়া’ শব্দের অর্থ উর্ধ্বে উঠেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা উপরের দিকে উঠেছেন। এ অর্থটিকেই ইমাম তাবারী তার

তাফসীর গ্রন্থে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন:

علا عليهن وارتفع، فدبرهن بقدرته، وخلقهن سبع سماوات

তিনি আকাশসমূহের ওপরে উঠলেন, ঊর্ধ্বে উঠলেন,
তিনি তার কুদরত দ্বারা আকাশসমূহ নিয়ন্ত্রণ করলেন,
এবং তা সাত আসমান হিসেবে সৃষ্টি করলেন।

ইমাম বাগাবী তার তাফসীরে অভিন্ন বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যা তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ও অধিকাংশ সালাফ তাফসীকারীদের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। ইস্তাওয়া শব্দের বাহ্যিক অর্থকে ধরে রাখতে গিয়েই তারা এরূপ তাফসীর করেছেন এবং ওপরে ওঠার আকার-প্রকৃতি-ধরণ কি তা তারা আল্লাহ তা‘আলার ইলমের কাছে সমর্পন করেছেন।

দ্বিতীয় বক্তব্য: ইস্তিওয়া শব্দের অর্থ এখানে পরিপূর্ণ মনোযোগ আরোপ করা। ইমাম ইবনে কাছীর সূরা আল বাকারার তাফসীরে এবং ইমাম বাগাবী সূরা ফুসসিলাত এর তাফসীরে এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। ইমাম ইবনে কাছীর বলেছেন: ‘অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা আকাশের প্রতি মনোযোগী হলেন। আর ইস্তিওয়া এখানে ইচ্ছা করা ও মনোযোগী হওয়ার অর্থকে শামিল করছে; কেননা এখানে ইস্তাওয়া ক্রিয়াপদেও পর إلى যুক্ত করা

হয়েছে। ইমাম বাগাবী বলেছেন, ‘অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা আকাশ সৃষ্টির দৃঢ় মনোযোগ পোষণ করলেন।’

বলার অপেক্ষা রাখে না যে উক্ত ব্যাখ্যায় বাণীকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি; কেননা ইস্তাওয়া ক্রিয়াপদটি এমন একটি অব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যা শেষ প্রান্ত বা সীমানা বুঝায়। অতএব তা এমন অর্থ বুঝাচ্ছে যা উক্ত অব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদাহরণ: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ﴾ [الحديد: ٤]

আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। *(আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

﴿وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ﴾ [المجادلة: ٧]

এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সংগেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। *(আল মুজাদালা: ৫৮: ৭)*

উল্লিখিত দুই আয়াতে যে বাণী রয়েছে তা প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থেই। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থটা এখানে **কি**?

এখানে কি বলা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবের সঙ্গে থাকেন এই অর্থে যে তিনি তাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা তারা যেসব জায়গায় থাকে সেসব জায়গায় আল্লাহর তা'আলার সত্তা অবস্থান করে।

না কি বলা হবে যে, এখানে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ বলতে বুঝায়, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবের সঙ্গে এই অর্থে থাকেন যে তিনি তাঁর জ্ঞানে, কুদরতে, শ্রবণে, দর্শনে, নিয়ন্ত্রণে এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে সকল মাখলুকের ঊর্ধ্বে আরশের ওপর থাকা সত্ত্বেও সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন?

এটা নিঃসন্দেহ যে প্রথম কথাটি এখানে প্রযোজ্য নয়, কেননা উল্লিখিত বাণীদ্বয়ের কনটেক্সট উক্ত কথাকে দাবি করে না। বরং কোনোভাবেই তা বুঝায় না; কেননা এখানে 'সঙ্গে-থাকা'র বিষয়টি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীব কর্তৃক পরিবেষ্টিত হবেন তা হতে পারে না। অর্থাৎ যদি বলা হয় যে আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিজীবের সঙ্গে থাকেন এই অর্থে যে তিনি তাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা তারা যেসব জায়গায় থাকে সেসব জায়গায় আল্লাহর তা'আলার সত্তা অবস্থান করে, তাহলে একথার দাবি হলো যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিবস্তু কর্তৃক

পরিবেষ্টিত থাকেন। আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা কখনো বলা যাবে না। উপরন্তু مَعِيَّة (সঙ্গে থাকা) আরবী ভাষার অর্থনির্দেশ-নীতি অনুযায়ী মিশে থাকা অথবা একই স্থানে সঙ্গে থাকাকে দাবি করে না। বরং সাধারণভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায়, এরপর স্থান অনুযায়ী সঙ্গে থাকার আকার-প্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

আর আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে-থাকাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ বাতিল যার অর্থ দাঁড়ায় মাখলুকের সঙ্গে মিশে থাকা অথবা মাখলুক যে জায়গায় থাকে সে জায়গায় অবস্থান করা। এ ধরনের ব্যাখ্যা কয়েকটি কারণে বাতিল:

প্রথম কারণ: এরূপ ব্যাখ্যা সালাফদের ইজমার উল্টো। সালাফদের কেউই এরূপ ব্যাখ্যা করেননি। বরং তারা এরূপ ব্যাখ্যা অস্বীকার করার ব্যাপারে একমত ছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ: কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তিবুদ্ধি, স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি ও সালাফদের ইজমার দ্বারা একথা প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা সর্বোচ্চে ও সর্বোর্ধ্বে। আর উক্ত ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চতা ও সর্বোর্ধ্বতার বিপরীত। আর যা দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীত হবে তা বাতিল। অতএব বান্দাদের সঙ্গে থাকার অর্থ যদি কেউ এভাবে করে যে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা বান্দাদের জায়গাতেই থাকেন তবে

কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তিবুদ্ধি, স্বচ্ছ মানবপ্রকৃতি ও সালাফদের ইজমা অনুযায়ী তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

তৃতীয় কারণ: উক্ত কথার যুক্তিগত এমন অযাচিত ফলাফল বের হয় যা আল্লাহ তা'আলার জন্য উপযোগী নয়।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে জানে, তাঁকে যথার্থরূপে সম্মান করে এবং আরবী ভাষায় معية অর্থাৎ 'সঙ্গে-থাকা' কাকে বলে তা বোঝে সে কখনোই একথা বলতে পারে না যে: আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সঙ্গে থাকার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে থাকেন অথবা তারা যে জায়গায় অবস্থান করে তিনিও সে জায়গায় অবস্থান করেন। আরবী ভাষা সম্পর্কে যে অজ্ঞ, সেই কেবল এরূপ কথা বলতে পারে।

অতএব এতে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে এ কথাটি বাতিল। যেহেতু এ কথাটি বাতিল তাই দ্বিতীয় কথাটিই সঠিক। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে এমনভাবে আছেন যে তিনি তাঁর ইলম, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন, নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও রুবুবিয়াতের যা যা দাবি আছে সবকিছুর নিরিখে তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন। এটাই হলো উল্লিখিত দুই আয়াতের নিঃসন্দেহ বাহ্যিক অর্থ; কেননা এ আয়াত দুটো হলো হক এবং হকের বাহ্যিক অর্থও হক। বাতিল কখনো আল কুরআনের

বাহ্যিক অর্থ হতে পারে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ফতওয়ায়ে হামাবিয়াতে বলেছেন (মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০৩): ‘আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক বান্দার সঙ্গে থাকার অর্থ জায়গা অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ তা‘আলা যখন বলেন:

﴿يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا﴾ [الحديد: ٤]

তিনি জানেন জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়। *(আল-হাদীদ: ৫৭: ৪)*

এরপর বলেন:

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ ﴾ [الحديد: ٤]

‘আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।’ *(আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

তখন আল্লাহ তা‘আলার এ ভাষণ বাহ্যিকভাবে যা বুঝায় তা হলো, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক বান্দাদের সঙ্গে-থাকার অর্থ হলো- তিনি তাদের সকল বিষয় জানেন, তিনি তাদের ওপর সাক্ষী, তিনি সকল বিষয়ের ওপর আধিপত্যশীল ও সর্বজ্ঞানী। এটাই হলো সালাফদের কথার অর্থ যে, ‘তিনি

তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন।'[১৫] এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণীর বাহ্যিক অর্থ ও হাকীকত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত দুটি বাণীরও একই অর্থ। আর তা হলো:

﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]

তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না।

এরপর তিনি বলেছেন:

﴿هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ﴾ [المجادلة: ٧]

তিনি তো তাদের সংগেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। *(সূরা আল মুজাদালা: ৫৮: ৭)*

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গারে ছাওরে তাঁর সাথীকে

---

[১৫] - এটাই হলো সালাফদের কথা, 'তিনি তাঁর ইলমের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন' এর অর্থ; কারণ যদি এটা আমাদের জানা থাকে যে আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বোচ্চতা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে আছেন, তাহলে এ সঙ্গে থাকার অর্থ হলো যে তিনি আমাদের বিষয়ে সর্বজ্ঞ, আমাদের সব কিছুর ব্যাপারে তিনি ওয়াকিবহাল, তিনি আমাদের ওপর সাক্ষী ও আধিপত্যশীল। সঙ্গে থাকার অর্থ এটা নয় যে তিনি তাঁর সত্তাসহ আমাদের সঙ্গে আছেন। (লেখক)।

যে বলেছিলেন:

﴿لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ﴾ [التوبة: ٤٠]

তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। *(আত-তাওবা: ৯: ৪০)*

এখানেও 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' বাহ্যিক অর্থেই। আর সার্বিক অবস্থা থেকে বুঝা গেলো যে এখানে সাথে-থাকার অর্থ - জ্ঞান ও সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সঙ্গে থাকা।

এরপর তিনি বলেন: " معية (সঙ্গে-থাকা) শব্দটি কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতি জায়গার দাবি অনুযায়ী তার অর্থ নির্ণিত হবে। হয়তো ভিন্ন ভিন্ন জায়গা অনুযায়ী এ শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে অথবা সকল স্থানে এক এক মাত্রার সম্মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও প্রত্যেক জায়গায়ই শব্দটি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তবে যে অর্থেই হোক না কেন, কোনো স্থলেই অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্তাসহ মাখলুকের সঙ্গে মিশে আছেন। যদি মিশে থাকতেন তবে বলা শুদ্ধ হতো যে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

সঙ্গে-থাকার দাবি এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা মাখলুকের সঙ্গে মিশে থাকে, এর দলিল হলো আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে মুজাদালার আয়াতের

শুরুতে এবং শেষে তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا۟ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝٧ ﴾ [المجادلة: ٧]

তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামতের দিনে তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত। *(আল মুজাদালা: ৫৮: ৭)*

উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থানুযায়ী, এখানে বান্দাদের ‘সঙ্গে-থাকা’র দাবি হলো- আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে পূর্ণ ইলম রাখেন এবং তাদের

আমল ও কর্মের কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। এখানে অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে আছেন, অথবা তিনি তাদের সঙ্গে জমিনের ওপর আছেন।

অনুরূপভাবে সূরায়ে হাদীদের আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে আরশের ওপরে উঠার কথা, তাঁর ব্যাপক ইলমের কথা বলেছেন এরপর তিনি বান্দাদের সঙ্গে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরিশেষে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন যে বান্দারা যা আমল করে সে সম্পর্কে তিনি সর্বদ্রষ্টা। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤ ﴾ [الحديد: ٤]

তিনিই আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। তিনি জানেন জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা

যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। *(আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এটা যে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে আছেন। তবে এ সঙ্গে থাকার অর্থ বান্দাদের বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা, বান্দাদের সকল আমল দেখা যদি সর্বোচ্চতায় আরশের ওপরে আছেন। আয়াতের অর্থ এটা নয় যে আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সঙ্গে মিশে আছেন, অথবা তাদের সঙ্গে জমিনে আছেন; কেননা এরূপ অর্থ হলে আয়াতের শুরুর অংশে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চতা ও আরশের ওপরে থাকার যে কথা রয়েছে তার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে।

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সঙ্গে আছেন এর দাবি হলো যে আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত, তিনি তাদের কথাবার্তার সর্বশ্রোতা, তিনি তাদের আমলসমূহের সর্বদ্রষ্টা, তিনি তাদের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী। তিনি তাদের জীবনদানকারী, মৃত্যুদাতা, ধনাঢ্য দাতা ও দরিদ্রকারী। তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করেন, তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলার রুবুবিয়াত ও তার পরিপূর্ণ

ক্ষমতা দাবি করে। সৃষ্টিজগতে হস্তক্ষেপ থেকে কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। যার এই শান তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর সৃষ্টির সাথে, যদিও তিনি তাদের ঊর্ধ্বে আরশের ওপরে প্রকৃত অর্থে।[১৬]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া 'আল আকীদা আল ওয়াসেতিয়া'য় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সাথে থাকার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- 'আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে থাকা এবং একই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে যা কিছু বললেন, তা প্রকৃত অর্থেই। এ ক্ষেত্রে কোনো অর্থবিকৃতির প্রয়োজন নেই। তবে অবশ্যই মিথ্যা ধারণা থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে বাঁচাতে হবে।' *(মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪২)*

তিনি আল ফাতওয়া আল হামাবিয়া (মাজমুউল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা ১০২, ১০৩)- তে বলেন, 'এ ক্ষেত্রে সার কথা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ গভীরভাবে অধ্যায়ন করবে সে পরিপূর্ণ হিদায়েত ও আলো লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি সে সত্যের অনুসরণকে উদ্দেশ্য বানায়, তাহরীফ ও বিকৃতি থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নাম

[১৬১৬] - এটা পেছনে গিয়েছে যে আরবী ভাষায় معية (সঙ্গে থাকা) মিশে থাকা অথবা এক জায়গায় থাকাকে দাবি করে না। (লেখক)

ও সিফাতের ক্ষেত্রে ইলহাদ ও বিকৃতির আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকে।'

আর কোনো ধারণাকারী এ ধারণা করবে না যে, উল্লিখিত বিষয়ের একটি অন্যটির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন কেউ বলল যে, 'আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে আছেন এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নায় যে বক্তব্য এসেছে তার বিপরীত বক্তব্য রয়েছে নিম্নবর্ণিত আয়াত ও হাদীসে। আয়াতটি হলো, (وَهُوَ مَعَكُمْ) 'আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন', আর হাদীসটি হলো, إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه 'যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় তাঁর সম্মুখেই থাকেন'।[১৭] এ জাতীয় ধারণা অর্থাৎ (আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের উপর উঠা সংক্রান্ত) উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে উক্ত আয়াত ও হাদীসটি সাংঘর্ষিক, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আর তা এ জন্যে যে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত অর্থেই আমাদের সঙ্গে

---

[১৭] - সহীহ বুখারীতে হাদীসটি এভাবে এসেছে : ' إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه ' অর্থাৎ ' তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে তখন আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তার চেহারার দিকে থাকেন।' হাদীস নং (৭৫৩)। সহীহ মুসলিমে হাদীসটি এভাবে এসেছে : ' إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى অর্থাৎ 'তোমাদের কেউ যখন সালতে থাকে সে যেন তার চেহারার দিকে থুথু না ফেলে, কেননা আল্লাহ তাআলা তার চেহারার দিকে থাকে যখন সে সালাত আদায় করে।' হাদীস নং (৫৪৭)।

আছেন, যেমন তিনি প্রকৃত অর্থেই আরশের ওপরে আছেন। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বিষয়কে একত্র করে বলেছেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۚ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٤ ﴾ [الحديد: ٤]

তিনিই আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে উঠেছেন। তিনি জানেন জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। *(সূরা আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আমাদের এ সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি আরশের ওপরে আছেন। তিনি সকল বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। যেমন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন: والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه (আর আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে, তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন।) [১৮]

আল্লাহ তা'আলার শানের জন্য যেভাবে উপযোগী সেভাবে তিনি বান্দার সঙ্গে থাকেন, এ কথার সঙ্গে, আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে আছেন, এর কোনো সংঘর্ষ নেই। বিষয়টি আমরা তিনভাবে বুঝতে পারি:

এক: আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বিষয়কে তাঁর কিতাবে একত্র করেছেন। যে কিতাব সকল বৈপরীত্ব থেকে মুক্ত। আর যে দুটি বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা একত্র করেছেন সে দুটির মাঝে কোনো বৈপরীত্ব থাকতে পারে না।

আর আল কুরআনের কোনো বিষয়ে বৈপরীত্য আছে বলে যদি ধারণা হয়, তাহলে আপনার উচিত হবে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যাতে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায় (অবৈপরীত্য বুঝা যায়)। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ ﴾ [النساء: ٨٢]

তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা

[১৮] - আদ্দুররুল মানছুর : ১/১০৯

> আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত। *(সূরা আন-নিসা: ৪: ৮২)*

যদি গভীরভাবে অধ্যয়নের পরও বিষয়টি স্পষ্ট না হয়, তাহলে যারা পাকাপোক্ত জ্ঞানের অধিকারী তাদের পথ অবলম্বন করতে হবে, যারা বলেন যে,

﴿ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٧﴾ [ال عمران: ٧]

> আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। *(সূরা আলে ইমরান: ৩: ৭)*

অতএব বিষয়টিকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে যিনি এ ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত। জেনে রাখবেন, যদি কোনো ত্রুটি থাকে তবে তা আপনার জ্ঞান ও বুঝের মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে আল কুরআন সকল বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।”

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. তার কথা (যেমন আল্লাহ তা‘আলা এ দুটিকে একত্র করেছেন) দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম র. বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি তাঁর সৃষ্টির সাথে আছেন যদিও তিনি আরশের ওপরে আছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা এ দুটিকে একত্র করে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন- এখানে তিনি সূরা আল-হাদীদের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন- এরপর তিনি বলেছেন: অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর আরশের ওপরে উঠেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে আছেন এ অর্থে যে তিনি আরশের ওপর থেকেই তাদের আমল দেখছেন, যেমন হাদীসে এসেছে: (আর আল্লাহ তা‘আলা আরশের ওপরে, তোমরা যে অবস্থায় আছ তিনি তা দেখছেন।) অতএব আল্লাহ তা‘আলার ঊর্ধ্বতা এবং মাখলুকের সঙ্গে থাকা, এ দুটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আর মাখলুকের সঙ্গে থাকা আল্লাহ তা‘আলার ঊর্ধ্বতাকে বাতিল করে দেয় না। বরং উভয়টিই সত্য।’[১৯]

দুই. ‘সঙ্গে থাকা’র প্রকৃত অর্থ উর্ধ্বতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এ উভয় বিষয় সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রেও একত্র হতে পারে। উদাহরণত যদি কেউ বলে যে ‘আমরা এখনও এ অবস্থায় চলছি যে চাঁদ আমাদের সাথে।’ তাহলে এ কথার দ্বারা কোনো বৈপরীত্য বুঝা যাবে না। কেউ এরূপ বুঝবে

---

[১৯] - ইবনুল মুসিলী, মুখতাসারুস্সাওয়াইক, পৃষ্ঠা ৪১০

না যে, চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে এবং আমাদের সঙ্গে চলতে শুরু করেছে। যদি সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয়, তাহলে সৃষ্টিকর্তা, যিনি সকল বিষয়কে পরিবেষ্টিত করে আছে, তিনি উর্ধ্বে থাকা সত্ত্বেও মাখলুকের সঙ্গে অবশ্যই থাকতে পারেন। এটা এ কারণে যে 'সঙ্গে থাকা'র প্রকৃত অর্থ এক জায়গায় একত্র হওয়াকে আবশ্যক করে না।

এ দিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেছেন যে, আরবীতে مع (সঙ্গে) শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন এর বাহ্যিক অর্থ হয় সাধারণভাবে তুলনা করা, যা আবশ্যিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ অথবা একে অন্যের ডানে বা বামে থাকাকে দাবি করে না। যদি 'সঙ্গে থাকা'র অর্থকে বিশেষ কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত হয়, তবে তা সে বিশেষ অর্থ-কেন্দ্রিক তুলনাকে বুঝাবে। বলা হয় যে, আমরা এখনও চলছি আর চাঁদ আমাদের সঙ্গে, অথবা তারকা আমাদের সঙ্গে। আরও বলা হয় যে 'এ বস্তুটি আমার সঙ্গে' যদিও তা আপনার মাথার ওপরে। কেননা আপনার উদ্দেশ্য হলো এ বস্তুর সঙ্গে আপনার সম্পৃক্ততা বর্ণনা করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও প্রকৃত অর্থেই তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন যদিও তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর আরশের ওপরে আছেন।'[২০]

---

[২০] - ইবনে তাইমিয়া, আল ফাতওয়া আল হামুবিয়াহ, দ্রঃ মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড ৫, পৃষ্টা ১০৩

তিন. যদি মেনেও নেই যে 'সঙ্গে থাকা' এবং ঊর্ধ্বতা এ দুটি বিষয় কোনো সৃষ্টিবস্তুর ক্ষেত্রে একত্র হতে পারে না, তবুও বলব যে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয় একত্র হওয়া নিষিদ্ধ নয়। কেননা তিনি নিজেই এ দুটি বিষয়কে একত্র করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা অতুলনীয়, তাঁর সঙ্গে কোনো মাখলুকের তুলনা হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۝١١﴾ [الشورى: ١١]

তাঁর মতো কোনো জিনিস নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(আশ-শুরা: ৪২: ১১)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ দিকে ইঙ্গিত করেই 'আল আকীদা আল ওয়াসেতিয়া' গ্রন্থে বলেছেন, 'কুরআন-সুন্নাহয় আল্লাহ তা'আলার নিকটতা অথবা সঙ্গে থাকার যে কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বতা ও সর্বোচ্চতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণসমগ্রের কোনোটির ক্ষেত্রেই তাঁর তুল্য কোনো বিষয় নেই। তিনি শীর্ষে থেকেও কাছে এবং নিকটে থেকেও ঊর্ধ্বে।'[২১]

পরিশিষ্ট: আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গেই আছেন, এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত:

---

[২১] - মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৩

প্রথম ভাগ:

এদের বক্তব্য হলো 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন', এখানে 'সঙ্গে থাকা'র দ্বারা যদি সাধারণভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায় তবে এর অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞানে ও সর্বব্যাপী ক্ষমতায় সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছেন। আর যদি বিশেষভাবে সঙ্গে থাকাকে বুঝায় তবে এর অর্থ হবে, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি থাকেন। যদিও আল্লাহ তা'আলা সত্তাগতভাবে সর্বোর্ধ্বে এবং আরশের ওপরে।

এঁরাই হলেন সালাফ এবং এঁদের মাযহাবই হলো সত্য। যেমনটি ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ:

এদের বক্তব্য হলো, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন' এ কথার দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা জমিনে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার সর্বোর্ধ্বে থাকা এবং আরশের ওপরে থাকাকে নাকচ করে দেন। এরা হলেন প্রাচীন জাহমিয়া ফেরকার অন্তর্গত হুলুলিয়া গোষ্ঠী। এদের মাযহাব বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। সালাফগণ এদের মাযহাব বাতিল হওয়া এবং প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে একমত। যেমনটি ওপরে বর্ণনা করা

হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ:

এদের বক্তব্য হলো, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন', এর দাবি হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে জমিনে আছেন এবং একই সঙ্গে সর্বোর্ধ্বে আরশের ওপরেও আছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এদের বক্তব্যকে মাজমুউল ফাতাওয়ায় তুলে ধরেছেন।[২২]

এরা মনে করেছেন যে 'সঙ্গে থাকা' এবং 'ঊর্ধ্বতা' এ উভয় বিষয়ে যেসব টেক্সট রয়েছে তার বাহ্যিক অর্থকে তারা ধারণ করতে পেরেছেন। কিন্তু তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এবং পথভ্রষ্ট হয়েছেন। কেননা 'সঙ্গে থাকা' বিষয়ে যেসব টেক্সট রয়েছে তা মাখলুকের সঙ্গে সত্তাগতভাবে আল্লাহ তা'আলার মিশে থাকাকে দাবি করে না। এটা বরং বাতিল। আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের কথার বাহ্যিক অর্থ কোনো বাতিল বিষয় হতে পারে না।

---

[২২]. দেখুন : মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ২২৯

একটি সতর্কতা

‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন’ আমাদের সালাফগণ যখন এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন, তখন এ ব্যাখ্যার দাবি এটা নয় যে তিনি কেবল তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমেই তাদের সঙ্গে আছেন। বরং এর দাবি এটাও যে তিনি তাঁর শ্রবণ, দর্শন, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং রুবুবিয়াতের এ জাতীয় আরও যে অর্থসমূহ রয়েছে এসব দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন।

আরেকটি সতর্কতা

বিগত পৃষ্ঠাগুলোয় এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছি যে আল্লাহ তা‘আলার উর্ধ্বাবস্থান কুরআন, সুন্নাহ, যুক্তিবুদ্ধি, ফিতরত ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

আল কুরআনের প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলার ঊর্ধ্বাবস্থান আল কুরআন দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রমাণিত। কখনো ‘উলু’ (ঊর্ধ্বতা), কখনো ‘ফাওকিইয়া’ (ওপরে থাকা), কখনো

ইস্তিওয়া ‘আলাল আরশ (আরশের ওপরে ওঠা), কখনো ‘আকাশে থাকা’ ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে:

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

আর তিনি সুউচ্চ, মহান। *(আল বাকারা: ২: ২৫৫)*

﴿ وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ﴾ [الانعام: ١٨]

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান। *(আল আনআম: ৬: ১৮)*

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٥ ﴾ [طه: ٥]

পরম করুণাময় আরশের ওপর উঠেছেন। *(তাহা: ২০: ৫)*

﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٦ ﴾ [الملك: ١٦]

যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদেরসহ জমিন ধ্বসিয়ে দেওয়া থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ? *(আল মুলক: ৬৭: ১৬)*

আবার কখনো আল্লাহর পানে বিভিন্ন বিষয়ের ঊর্ধ্বগমন, ওপরের দিকে ওঠা এবং আল্লাহর দিকে উঠিয়ে নেওয়া এ জাতীয় শব্দ দ্বারা আল কুরআন

আল্লাহ তা‘আলার ঊর্ধ্বাবস্থানকে নির্দেশ করেছে। যেমন নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহে:

﴿إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠]

তাঁরই পানে উত্থিত হয় ভাল কথা। *(ফাতির: ৩৫: ১০)*

﴿ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾ [المعارج: ٤]

ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়। *(আল মাআরিজ: ৭০: ৪)*

﴿ إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [ال عمران: ٥٥]

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, ‘হে ঈসা, নিশ্চয় আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব, তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব।’ *(আলে ইমরান: ৩: ৫৫)*

আবার কখনো বা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে কোনো কিছু ‘অবতরণ করা’ ও তৎসংলগ্ন শব্দ দিয়ে আল কুরআন আল্লাহ তা‘আলার ঊর্ধ্বাস্থানকে প্রমাণিত করেছে, যেমন নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে:

﴿ قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ ﴾ [النحل: ١٠٢]

বল, রূহুল কুদস (জীবরীল) একে (কুরআনকে) তোমার রবের পক্ষ হতে যথাযথভাবে নাযিল করেছেন। *(সূরা আন-নাহল: ১৬: ১০২)*

﴿ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ﴾ [السجدة: ٥]

তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা তাঁরই দিকে উত্থিত হয়। *(আস-সাজদাহ: ৩২: ৫)*

সুন্নতের প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ অবস্থান কথা, কর্ম ও অনুমোদন এ তিন প্রকার সুন্নত দ্বারাই প্রমাণিত এবং তা বহু হাদীসে নানাভাবে এসেছে এবং সবগুলো মিলে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। নিম্নে এ জাতীয় কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদারত অবস্থায় বলেছেন:

«سبحان ربي الأعلى»

(পবিত্র মহান আমার রব, যিনি সর্বোচ্চ)[২৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন:

«إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه:

إن رحمتي سبقت غضبي»

আল্লাহ তা‘আলা যখন সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি তাঁর কাছে আরশের ওপর লিখলেন, নিশ্চয় আমার রহমত আমার রাগ থেকে অগ্রগামী হয়েছে[24]।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»

তোমরা কি বিশ্বাস করবে না; অথচ আমি হলাম যিনি

---

[২৩] - মুসলিম হাদীস নং ৭৭২

[24] - বুখারী, হাদীস নং ৭৪২২; মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫১।

আকাশে আছেন তাঁর বিশ্বাসের পাত্র।[২৫]

হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন মিম্বারে থাকা অবস্থায় দু'হাত উত্তোলন করেছেন এবং বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উদ্ধার করুন![26]'

আর তিনি আরাফার দিন খুতবা প্রদানকালে আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করেছেন যখন মানুষেরা বলেছে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব আদায় করেছেন এবং নসীহত করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, اللهم اشهد (হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন)[27]।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কৃতদাসীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহ কোথায়?' উত্তরে সে বলল যে, 'আসমানে'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা মেনে নিলেন এবং তার মনিবকে বললেন, 'তাকে আযাদ করে দাও, নিশ্চয় সে মুমিনা'[28]।

---

২৫ - বুখারী, হাদীস নং ৪৩৫১

26 - বুখারী, হাদীস নং ১০১৪; মুসলিম, হাদীস নং ৮৯৭।

27 - মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

28 - মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৭।

যুক্তিনির্ভর প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলিতে গুণান্বিত এবং সকল অপূর্ণাঙ্গ গুণাবলি হতে পবিত্র, মানুষের আকল বুদ্ধি এ বিষয়টিকে আবশ্যক মনে করে। আর ঊর্ধ্বাবস্থান হলো আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির একটি। আর নিম্নাবস্থান হলো একটি অপূর্ণাঙ্গ গুণ। অতএব ঊর্ধ্বাবস্থানের গুণে গুনান্বিত থাকা এবং এর বিপরীতটা থেকে পবিত্র থাকা আল্লাহ তা'আলার জন্য একটি আবশ্যক বিষয়।

ফিতরতের প্রমাণ

ফিতরত বা সুস্থ মানবপ্রকৃতি আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বাবস্থানকে অত্যন্ত প্রাকৃতিকভাবেই নির্দেশ করে। এমন কোনো প্রার্থনাকারী বা ভীতু-আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তি নেই যে শাণিত আগ্রহ নিয়ে আল্লাহর পানে ছুটে যায় অথচ ডানে বামে না তাকিয়ে কেবল ঊর্ধ্বপানে অনুভূতি ব্যক্ত করার আগ্রহ অন্তরে জাগ্রত হয় না।

আপনি মুসল্লীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন তারা যখন سبحان ربي الأعلى (পবিত্র মহান আমার রব, যিনি সর্বোচ্চ) এ কথা বলে তখন তাদের অন্তর

কোন দিকে ধাবিত হয়?

ইজমার প্রমাণ

সাহাবী, তাবেঈ ও ইমামগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহের ঊর্ধ্বে আরশের ওপরে আছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের কথা খুবই প্রসিদ্ধ। ইমাম আওযা'ঈ র. বলেন:

«كنا، والتابعون متوافرون، نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات»

তাবে'ঈগণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান থাকা অবস্থায় আমরা বলতাম যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে, আর আমরা ঈমান আনি সিফাত সম্পর্কে সুন্নতে যা এসেছে তার প্রতি।

আলেমদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কোনো ইখতিলাফ, মতানৈক্য নেই, থাকা সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে বহু বড় বড় প্রমাণ একত্র হয়েছে যেগুলোর বিপরীতে কেবল ওই অহঙ্কারী ব্যক্তিই যেতে পারে যার অন্তরাত্মা মুছে দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তার ফিতরতকে কলুষিত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা নিরাপত্তা ও পরিত্রাণ কামনা করি।

সত্তা ও গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার ঊর্ধ্বাবস্থান সকল বিষয়ের মধ্যে অধিক স্পষ্ট এবং বাস্তবতার নিরিখে অধিক প্রতিষ্ঠিত বিষয়, যার প্রমাণাদি অতি সুস্পষ্ট।

তৃতীয় সতর্কতা

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে থাকার ব্যাপারে ওপরে যে কথা বললাম সে জাতীয় কথা আমি আমার কিছু ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে এক মজলিসে বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে: আমাদের আকীদা হলো, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার সঙ্গে থাকার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার শানের জন্য উপযোগী কায়দায় সত্ত্বাগতভাবে প্রকৃত অর্থেই। আর এর দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইলম, কুদরত, শ্রবণ, দর্শন, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকা থেকে পবিত্র। অথবা

তারা যে স্থলে আছে সে স্থলে অবস্থান করা থেকেও তিনি পবিত্র। বরং আল্লাহ তা‘আলা হলেন তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে সর্বোচ্চ। তাঁর সর্বোচ্চতা তাঁর সত্তাগত গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত, যা কখনো তাঁর সত্তা থেকে আলাদা হয় না। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আরশের ওপরে আছেন তাঁর শানের জন্য যেভাবে উপযোগী সেভাবে। আর এটা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির ‘সঙ্গে থাকা’র সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

‘আল্লাহ তা‘আলার মতো কোনো জিনিস নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ *(আশ্‌-শূরা: ১১)*

ওপরে আমি বলেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক বান্দার সঙ্গে থাকার বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলার শানের জন্য উপযোগী কায়দায় ‘সত্ত্বাগতভাবে ’প্রকৃত অর্থেই। এখানে ‘সত্তাগতভাবে’ বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘সঙ্গে থাকা’র প্রকৃত অর্থের প্রতি জোর দেওয়া।

আমি আমার কথা দ্বারা এটা বুঝাতে চাইনি যে, আল্লাহ তা‘আলা জমিনের ওপর তার সৃষ্টির সঙ্গে আছেন। এটা আমি কীভাবে বলতে পারি, আমি তো আমার ওই লেখাতেই বলেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া থেকে পবিত্র। অথবা তাদের জায়গায় অবস্থান করা থেকে পবিত্র।

আর আল্লাহ তা‘আলা তার সত্তা ও গুণাবলিতে সর্বোচ্চ এবং তাঁর সর্বোচ্চতা তাঁর সত্তাগত একটি গুণ, যা আল্লাহ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। আমি সে লেখায় এটাও বলেছি যে: ‘আমরা মনে করি, যে ব্যক্তি ধারণা করবে আল্লাহ তা‘আলা সত্তাগতভাবে সকল জায়গায় বিরাজমান সে কাফের অথবা পথভ্রষ্ট, যদি এটা তার আকীদা হয়ে থাকে। আর যদি সে এ ধারণাকে সালাফ অথবা ইমামদের কারও সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তবে সে মিথ্যাবাদী।’

আর জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি, যে নাকি যথার্থরূপে আল্লাহ তা‘আলাকে কদর করে, তার পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা‘আলা জমিনে তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে রয়েছেন। আমি আমার সকল বৈঠকে, অতীতে যেমনি বর্তমানেও তেমনি, এ কথাটি অস্বীকার করে আসছি। দো‘আ করি, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এবং আমার সকল মুসলিম ভাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে সত্য-সঠিক কথার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

আমি এ ব্যাপারে, পরবর্তীতে রিয়াদ থেকে ছাপা আদ-দাওয়া পত্রিকায় (সংখ্যা ৯১১, তারিখ ৪ মুহাররাম, ১৪০৪ হি.) একটি প্রবন্ধ লিখেছি যেখানে ইমাম ইবনে তাইমিয়া যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটিকেই তাগিদ করে বলেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে থাকা সত্য এবং প্রকৃত অর্থেই এবং তা হুলুল এবং সৃষ্টির সঙ্গে মিশে থাকাকে দাবি করে

না। আমি এখানে ‘সত্তাগতভাবে’ শব্দটিকে বাদ দেওয়া জরুরি মনে করেছি। আল্লাহ তা‘আলার ঊর্ধ্বাবস্থান এবং সৃষ্টির সঙ্গে থাকা, এ দুটি কীভাবে আমরা একত্র করব তা আমি সেখানে বর্ণনা করেছি।

জেনে রাখুন যে প্রত্যেক এমন শব্দ যা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক জমিনে অবস্থান অথবা সৃষ্টির সঙ্গে সংমিশ্রণকে আবশ্যক করে অথবা আল্লাহ তা‘আলার সর্বোচ্চ অবস্থানকে নাকচ করে দেয় অথবা আরশের ওপরে থাকাকে নাকচ করে দেয়, অথবা এমন কোনো বিষয়কে আবশ্যক করে যা আল্লাহ তা‘আলার জন্য উপযোগী নয়, তবে এমন শব্দ বাতিল বলে পরিগণিত হবে। এমন শব্দ যে উচ্চারণ করবে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, সে যেই হোক না কেন এবং যেকোনো শব্দ দিয়েই সে তা প্রকাশ করে থাক না কেন।

আর প্রত্যেক এমন শব্দ যার দ্বারা এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যা আল্লাহর জন্য উপযোগী নয় - হোক তা সীমিত কিছু মানুষের কাছে - তবে তা বর্জন করা জরুরি। যাতে আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করার সুযোগ না আসে। তবে আল্লাহ তা‘আলা নিজের জন্য তাঁর কিতাবে যা সাব্যস্ত করেছেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে যা সাব্যস্ত করেছেন, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা ওয়াজিব এবং যেসব ধারণা আল্লাহর জন্য উপযোগী নয় সেসব ধারণাও বাতিল করে দেওয়া

ওয়াজিব।

ষষ্ঠ ও অষ্টম উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ ١٦﴾ [ق: ١٦]

আর আমি[২৯] তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে। *(সূরা কাফ: ৫০: ১৬)*

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنكُمۡ﴾ [الواقعة: ٨٥]

আর তোমাদের চাইতে আমি তার অধিক কাছে। *(সূরা আল ওয়াকিয়াহ: ৫৬: ৮৫)*

তাফসীর গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত দু‘ আয়াতে ‘অধিক কাছে’ বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে।

---

[২৯] ইবনে কাসীর বলেন, এখানে نحن বলে আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

জওয়াব

উল্লিখিত দু' আয়াতে অধিক কাছে বলতে ফেরেশতারা অধিক কাছে বলে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাতে বাণীকে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে না। গভীরভাবে চিন্তা করলে এ বিষয়টি আমাদের বুঝে আসে।

প্রথম আয়াত

এখানে **'কাছে থাকা'**র বিষয়টি এমন কিছুর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা ফেরেশতাদের নিকটতাকেই বুঝা যায়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ ١٦ إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ١٧ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ١٨﴾ [ق: ١٦، ١٨]

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর

আমি[৩০] তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে। যখন ডানে ও বামে বসা দু’জন লিপিবদ্ধকারী লিখতে থাকবে তার প্রত্যেক কর্ম ও কাজ সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে। *(সূরা কাফ: ৫০: ১৬ - ১৭)*

এখানে إِذْ يَتَلَقَّى (যখন... গ্রহণ করবে) দ্বারা এটা বুঝা যাচ্ছে যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লিপিবদ্ধকারী দুই ফেরেশতার নিকটতা।

দ্বিতীয় আয়াত

দ্বিতীয় আয়াতে যে ‘নিকটতা’র কথা বলা হয়েছে, তা বান্দার মৃত্যুকালীন অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর মৃত্যুকালে বান্দার কাছে যারা উপস্থিত হন তারা হলেন ফেরেশতা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ رُسُلُنَا وَهُمۡ لَا يُفَرِّطُونَ ٦١﴾ [الانعام: ٦١]

অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা

---

[৩০] ইবনে কাসীর বলেন, এখানে نحن বলে আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

কোনো ত্রুটি করে না। *(সূরা আল আন'আম: ৬: ৬১)*

মানুষের মৃত্যুকালে ফেরেশতাই যে বান্দার নিকটে আসেন, এর আরেকটি প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার কথা:

﴿وَلَٰكِن لَّا تُبۡصِرُونَ ٨٥﴾ [الواقعة: ٨٥]

কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। *(আল ওয়াকিয়া: ৫৬: ৮৫)*

কেননা এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে যিনি নিকটবর্তী হন তিনি ঠিক ওই জায়গাতেই নিকটবর্তী হন যে জায়গাতে মৃত্যুগামী ব্যক্তি রয়েছে। অথচ আমরা তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এ বিষয়টি ফেরেশতা কর্তৃক নিকটতাকে নির্ধারণ করে দিচ্ছে; কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এ প্রকৃতির নিকটতা অসম্ভব।

একটি প্রশ্ন

এখানে একটি প্রশ্ন এভাবে উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি ফেরেশতাই নিকটবর্তী হবেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা কেন বললেন যে, 'আমি তার নিকটে'? অর্থাৎ 'নিকটতা'-কে আল্লাহ তা'আলা নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কেন উল্লেখ করলেন? এ প্রকৃতির অভিব্যক্তির উদাহরণ কি অন্য কোথাও

পাওয়া যায়?

উত্তর

আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশতার নিকটতাকে তাঁর নিজের নিকটতা বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ ফেরেশতার নিকটতা আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশেই ঘটে থাকে। ফেরেশতারা হলেন সৈন্য ও দূত।

ফেরেশতার নিকটতাকে আল্লাহ তা‘আলা নিজের নিকটতা বলে ব্যক্ত করার উদাহরণ আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে, যেমন:

﴿ فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ قُرۡءَانَهُۥ ١٨ ﴾ [القيامة: ١٨]

> অতঃপর যখন আমরা তা পাঠ করি (জিবরাঈলের মাধ্যমে) তখন তুমি তার পাঠের অনুসরণ কর। *(সূরা আল কিয়ামাহ: ৭৫: ১৮)*

উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআন পাঠ মূলত ফেরেশতা জিব্রীল আ. এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এ পাঠকে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলেছেন, ‘যখন আমি তা পাঠ করি’। এটা এ হিসেবে যে, জিব্রীল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহর নির্দেশেই কুরআন পাঠ করেছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলার বাণী-

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنۡ إِبۡرَٰهِيمَ ٱلرَّوۡعُ وَجَآءَتۡهُ ٱلۡبُشۡرَىٰ يُجَٰدِلُنَا فِي قَوۡمِ لُوطٍ ۝٧٤ ﴾ [هود: ٧٤]

অতঃপর যখন ইবরাহীম থেকে ভয় দূর হল এবং তার কাছে সুসংবাদ এল, তখন সে লূতের কওম সম্পর্কে আমাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। *(সূরা হুদ: ১১: ৭৪)*

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম আ. লূত আ. কওম সম্পর্কে আল্লাহর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলেন। অথচ আমরা জানি যে তিনি ফেরেশতাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু ফেরেশতারা আল্লাহর দূত হিসেবে এসেছিলেন সে হিসেবে তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করা এক অর্থে আল্লাহর সঙ্গেই বাদানুবাদ করা।

নবম ও দশম উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ تَجۡرِي بِأَعۡيُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]

যা আমার চাক্ষুস তত্ত্বাবধানে চলত। *(সূরা আল কামার: ৫৪: ১৪)*

এবং মূসা আ. কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَلِتُصۡنَعَ عَلَىٰ عَيۡنِيٓ ۝٣٩﴾ [طه: ٣٩]

যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও'। *(তাহা: ৩৯)*

জওয়াব:

উল্লিখিতি দু'আয়াতের অর্থও বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ। তবে এখানে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

এখানে কি এটা বুঝানো হয়েছে যে, নূহ আ. এর কিশতি আল্লাহর চোখে চলত? কারণ بِأَعْيُنِنَا এর আক্ষরিক অর্থ 'আমার চোখে'? অথবা দ্বিতীয় আয়াত অনুযায়ী মূসা আ. কি আল্লাহর চোখের ওপর প্রতিপালিত হয়েছেন? কেননা عَلَى عَيْنِي এর আক্ষরিক অর্থ 'আমার চোখের ওপর'?

নাকি বলা হবে যে, এখানে বাহ্যিক অর্থ হলো - নূহ আ. কিশতি এভাবে চলত যে আল্লাহর চক্ষু তাকে তত্ত্বাবধান করত, অনুরূপভাবে মূসা আ. এর প্রতিপালনও আল্লাহর চোখের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রথম কথাটি যে বাতিল এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কারণ:

এক. আরবী ভাষার ব্যবহারগত দাবি উক্ত কথার পক্ষে নয়। আর পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে: এরশাদ হয়েছে:

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢ ﴾ [يوسف: ٢]

নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। *(ইউসুফ: ১২: ২)*

অন্য এক আয়াতে এসেছে:

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٥]

বিশ্বস্ত আত্মা[৩১] এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। *(আশ-শু'আরা: ২৬: ১৯৩ - ১৯৫)*

অতএব আরবী ভাষায় যদি কেউ বলে فلان يسير بعيني যার আক্ষরিক অর্থ

[৩১] এখানে 'বিশ্বস্ত আত্মা' দ্বারা জিব্রীল (আঃ) কে বুঝানো হয়েছে।

হলো (অমুক ব্যক্তি আমার চোখে চলছে); কিন্তু কেউ কি উক্ত বাক্যটিকে এ অর্থে বুঝবে? বরং বাক্যটির প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থ হলো (অমুক ব্যক্তি আমার চোখের সামনে বা তত্ত্বাবধানে চলছে)। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে فلان تخرج على عيني যার আক্ষরিক অর্থ হলো (অমুক ব্যক্তি আমার চোখের ওপর পড়া লেখা সম্পন্ন করেছে), কিন্তু কেউ কি এ অর্থে বাক্যটিকে বুঝবে? বরং বাক্যটি থেকে যে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ বুঝে থাকে তা হলো, (অমুক ব্যক্তি আমার চোখের সামনেই পড়ালেখা সম্পন্ন করেছে।) যদি কেউ উল্লিখিত দু'বাক্যের আক্ষরিক অর্থকে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ বলতে চায় তবে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা দূরে থাক মুর্খ ব্যক্তিরাও তাকে নিয়ে হাসবে।

দুই. উল্লিখিত দু'আয়াতের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ নির্ধারণে প্রথমোক্ত কথাটি আল্লাহর জন্য কোনোক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যে ব্যক্তির ইলম রয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাঁকে যথার্থরূপে কদর করে, তাঁর পক্ষে এ ধরনের অর্থ নির্ধারণ করা কখোনই সম্ভব নয়; কেননা আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে আছেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে আলাদা। তিনি মাখলুখের মাঝে সত্তাসহ অবস্থান করেন না। তিনি কোনো মাখলুকের অভ্যন্তরেও অবস্থান করেন না এবং আল্লাহর মধ্যেও তাঁর কোনো মাখলুক অবস্থান করে না। আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে।

শব্দগত এবং অর্থগতভাবে উল্লিখিত দু'আয়াতের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে প্রথম কথাটি স্পষ্টরূপে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় কথাটিই বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়: অর্থাৎ নূহ আ. এর কিশতি এভাবে চলেছে যে আল্লাহর চক্ষু তাকে তত্ত্বাবধান করেছে। অনুরূপভাবে মূসা আ. এভাবে প্রতিপালিত হয়েছেন যে, আল্লাহর চক্ষু তাকে তত্ত্বাবধান করেছে। সালাফদের কেউ কেউ 'আমার দৃষ্টির সামনে' বলে যে অর্থ করেছেন তাও এ বিষয়টিকে বুঝাচ্ছে; কারণ আল্লাহ তা'আলার যদি কাউকে তাঁর চক্ষু দ্বারা তত্ত্বাবধান করেন, তাহলে এ তত্ত্বাবধানের দাবি হলো যে তিনি তাকে দেখছেন। আর বিশুদ্ধ অর্থের দাবি হিসেবে যে অর্থ আসে তা ওই অর্থেরই অংশ। একটি শব্দ থেকে অর্থ উদ্ধারের সুবিদিত যে নিয়ম রয়েছে তার নিরিখেই এ জাতীয় অর্থ বিশুদ্ধ বলে পরিগণিত। আর আমরা জানি যে একটি শব্দ তিনভাবে তার অর্থনির্দেশ করে। **'মুতাবাকাহ'** তথা হুবহু অর্থনির্দেশ, **'তাদাম্মুন'** তথা শামিলগতভাবে অর্থনির্দেশ এবং **'ইলতিযাম'** তথা দাবিগতভাবে অর্থনির্দেশ।

একাদশ উদাহরণ

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

«وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»

(আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটতা অর্জন করতে থাকে এ পর্যন্ত যে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে পাকড়াও করে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে চায় তবে আমি তাকে অবশ্যই দিই। সে যদি আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে নিশ্চয় আমি তাকে আশ্রয় দিই।)

উত্তর

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে কিতাবুর রিকাক এর আওতাধীন ৩৮ নং

অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে।[৩২]

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত হাদীসটিকে বাহ্যিক অর্থেই নিয়েছেন, কিন্তু এ হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ কী?

হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ কি এটা যে, আল্লাহ তা'আলা একজন ওলীর কান, চোখ, হাত ও পা হয়ে যান?

নাকি হাদীটির বাহ্যিক অর্থ এটা যে, আল্লাহ তা'আলা একজন ওলীর কান, চোখ, হাত ও পাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। যাতে তার অনুভূতি ও আমল আল্লাহ কেন্দ্রিক হয়ে যায়।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রথম কথাটি হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ হতে পারে না। এটা বরং হাদীসটির দাবিগত অর্থও হতে পারে না। আর তা দু'কারণে:

প্রথম কারণ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **'আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটতা অর্জন করতে থাকে এ পর্যন্ত যে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।'** তিনি আরো বলেছেন যে, **'সে যদি আমার কাছে চায় তবে আমি তাকে**

---

[৩২] - বুখারী, হাদীস নং (৬৫০২)

অবশ্যই দিই। সে যদি আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে নিশ্চয় আমি তাকে আশ্রয় দিই।' এখানে বান্দা ও মাবুদ, নিকটতা অর্জনকরী ও যার নিকটতা অর্জন করা হচ্ছে, যিনি ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসা হচ্ছে, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনার পাত্র, দাতা ও গ্রহীতা, আশ্রয় প্রার্থী ও আশ্রয়দাতার মধ্যে পার্থক্যটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হাদীসের অনুপম বক্তব্য ভিন-ভিন্ন দুই সত্তাকে বুঝাচ্ছে, যাদের একজন অন্যজন থেকে আলাদা। অতঃপর একজন অপর জনের গুণ অথবা অপর জনের অংশসমূহের মধ্যে কোনো অংশে পরিণত হতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ

ওলীর কান, চোখ, হাত ও পা- এগুলো হলো ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বা অংশ। আর এটা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ধারণা করতে পারে না যে, যিনি অনাদি-অনন্ত, তিনি একটি সৃষ্টিজীবের কান, চোখ, হাত ও পায়ে পরিণত হয়ে যাবেন, এ জাতীয় অর্থ তো কল্পনা করতেও মনে ঘৃণার উদ্রেক করে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়ার জন্যও এ জাতীয় কথা জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করা মুশকিল। অতএব কি করে বলা শুদ্ধ হতে পারে যে এটাই হলো হাদীসের বাহ্যিক অর্থ এবং এ বাহ্যিক অর্থ থেকে সরে আসা হয়েছে? আপনি পবিত্র-মহান হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার, আপনার গুণ বর্ণনা করে শেষ করতে পারব না, আপনি যেভাবে নিজেকে গুণান্বিত

করেছেন আপনি ঠিক সে রকমই।

প্রথম কথাটি বাতিল ও নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হওয়ার পর দ্বিতীয় কথাটিই শুদ্ধ হিসেবে থেকে যায়। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা ওলীর কান, চোখ ও আমলকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এমনভাবে যে, তার কান-চোখ দিয়ে অনুভব করা, হাত-পা দিয়ে কাজ করা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, সে সাহায্য চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চায়, ইত্তিবা ও বিধিবিধান পালন শুধু আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। অতএব পরিপূর্ণ ইখলাস, আল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং শরীয়ত ও বিধান পালন এসবগুলোই তার মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে একত্র হয়। আর এটাই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ তাওফীক। সালাফগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেই দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যাটি হাদীসের শব্দমালার যে বাহ্যিক অর্থ রয়েছে তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। হাদীসটির কন্টেক্সট থেকে যে প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ব্যাখ্যা কোনো তাবিল-নির্ভর ব্যাখ্যা নয়। এ ব্যাখ্যায় বাহ্যিক অর্থ থেকে দূরে চলে যাওয়াও হয়নি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়া।

দ্বাদশতম উদাহরণ

হাদীসে কুদসীতে এসেছে:

«من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة».

যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হলো, আমি এক হাত পরিমাণ তার নিকটবর্তী হলাম। আর যে ব্যক্তি এক হাত পরিমাণ আমার নিকটবর্তী হলো আমি এক গজ পরিমাণ তার নিকটবর্তী হলাম। আর যে ব্যক্তি আমার কাছে হেঁটে এল, আমি তার কাছে দৌড়ে যাই।

হাদীসটি সহীহ। ইমাম মুসলিম হাদীসটি যিকির ও দো‘আ অধ্যায়ে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ একটি হাদীস তিনি উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুত্ তাওহীদ, অনুচ্ছেদ পনেরতে আবু হুরায়রা

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন।[৩৩]

[জওয়াব:]

এই হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার ওই সকল কর্মকে বুঝাচ্ছে যা তিনি সম্পাদন করতে ইচ্ছা করেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। এ বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীসমূহে:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। *(সূরা আল বাকারা: ২: ১৮৬)*

﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ٢٢ ﴾ [الفجر: ٢٢]

আর তোমার রব ও ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবেন সারিবদ্ধভাবে। *(সূরা আল ফাজর: ৮৯: ২২)*

---

৩৩ - বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫; মুসলিম হাদীস নং ২৬৭৫

﴿ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَوۡ يَأۡتِيَ رَبُّكَ أَوۡ يَأۡتِيَ بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَۗ﴾ [الانعام: ١٥٨]

তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতাগণ হাজির হবে, কিংবা তোমার রব উপস্থিত হবে অথবা প্রকাশ পাবে তোমার রবের আয়াতসমূহের কিছু? *(সূরা আল আনআম: ৬: ১৫৮)*

﴿ ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ۝٥ ﴾ [طه: ٥]

দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন। *(সূরা তাহা: ২০: ৫)*

অনুরূপভাবে হাদীসে এসেছে:

«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»

আমাদের রব প্রতি রাতেই নিম্নাকাশে নেমে আসেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় প্রহর অবশিষ্ট থাকে।[৩৪]

---

৩৪ - এ হাদীসটির সূত্র পূর্বে গিয়েছে

অন্য এক হাদীসে এসেছে:

«ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه»

যখন কোনো ব্যক্তি হালাল সম্পদ থেকে কিছু দান করে - আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত গ্রহণ করেন না- তখন দয়াময় তা তাঁর ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করেন।[৩৫]

এ জাতীয় আরো অন্যান্য আয়াত ও হাদীস যা ইচ্ছাকৃত কর্মসমূহ আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াকে নির্দেশ করে। অতএব হাদীসে যে উল্লিখিত হয়েছে, 'আমি তার নিকটবর্তী হই', 'আমি তার দিকে দৌড়ে আসি' তা এই পর্যায়ের।

সালাফগণ তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত উল্লিখিত ধরনের বাণীসমূহকে আল্লাহ তা'আলার শানের জন্য উপযোগীভাবে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থেই নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তারা কোনো 'তাকঈফ' তথা ধরন-

---

[৩৫] - বুখারী, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হালাল উপার্জন থেকে সদাকা করা, হাদীস নং ১৪১০; মুসলিম, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : হালাল উপার্জনের সদাকা কবুল হওয়া, হাদীস নং ১০১৪

ধারণ নির্ধারণ এবং ‘তামছীল’ তথা উদাহরণ নির্ধারণের আশ্রয়ে যান না। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আল্লাহর নিম্নাকাশে নেমে আসা বিষয়ক হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন (দ্র. মাজমুউল ফাতাওয়া: খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৬৬): আল্লাহ তা‘আলার নিকটবর্তী হওয়া এবং কিছু বান্দার কাছে আসা- যারা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাকৃত কর্ম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার আগমণ, তাঁর অবতরণ ও আরশের ওপরে আরোহনকে সাব্যস্ত করে - তারা উল্লিখিত হাদীসে নিকটবর্তী হওয়ার যে কথা আছে সেটাকেও সাব্যস্ত করেন।’

অতএব এ কথা বলতে বাধা কি যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার নিকটবর্তী হন, তিনি যেভাবে চান সেভাবে, তাঁর ঊর্ধ্বাবস্থান সত্ত্বেও?

কোনো ধরন-ধারণ নির্ধারণ না করে, অথবা কোনো উদাহরণ না দিয়ে এ কথা বলতে বাধা কি যে আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আসবেন?

এটা তো আল্লাহ তা‘আলার কামাল ও পূর্ণাঙ্গতারই একটি বিষয় যে তিনি তাঁর শান মোতাবেক যা ইচ্ছা তাই করবেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এ হাদীসে আল্লাহ তা‘আলার যে কথাটি এসেছে যে, **‘আমি তাঁর নিকট দৌড়ে যাই’**, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য কাজ করে যায় এবং শরীর ও

অন্তর উভয়টা নিয়ে আল্লাহর পানে ধাবিত হয়, তাকে আল্লাহ তা‘আলা অতিদ্রুত গ্রহণ করে নেন। আর আল্লাহ তা‘আলা আমলকারীকে যে প্রতিদান দেন তা আমলকারীর আমলের চেয়েও অধিক পরিপূর্ণ। তারা তাদের এ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, **‘যে আমার কাছে হেঁটে আসে’**। আর এটা জ্ঞাত বিষয় যে, আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জনকারী, আল্লাহ তা‘আলার কাছে পৌঁছতে আগ্রহী ব্যক্তি কেবলমাত্র হাঁটার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জন করে না, বরং কখনো হাঁটার মাধ্যমে, যেমন সালাতের উদ্দেশে মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া, হজ পালনের উদ্দেশে হেঁটে যাওয়া, আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে হেঁটে যাওয়া ইত্যাদি। আবার কখনো রুকু-সিজদা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য অর্জন করে থাকে, যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘নিশ্চয় বান্দা আল্লাহ তা‘আলার অতি নিকটবর্তী থাকে তখন যখন সে সিজদারত থাকে।’[৩৬] বরং বান্দা বিছানায় শুয়ে থেকেও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ﴾ [ال عمران: ١٩١]

[৩৬] - মুসলিম, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : রুকু ও সিজদায় যা বলা হবে, হাদীস নং ৪৮২

যারা আল্লাহহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে। (সূরা আলে ইমরান: ৩: ১৯১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমরান ইবনে হুসাইনকে বলেছেন:

«صل قائما، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»

তুমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়, যদি না পার তাহলে বসে, আর যদি না পার তাহরে কাত হয়ে।[৩৭]

উক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ বলেন: যদি বিষয়টি এ রকমই হয়, তাহলে হাদীসটির উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমলের যে বিনিময় দেন তা বর্ণনা করা। আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হবে, সে যদি ধীরগামীও হয় তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে তার আমলের চেয়েও উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দেবেন। আর এটাই হলো হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ যার অনন্য বক্তব্য থেকে শরঈ ইঙ্গিত অনুযায়ী বুঝা যাচ্ছে।

---

[৩৭] - বুখারী, জুমআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যদি বসে নামাজ পড়তে না পাড়ে তবে কাত হয়ে, হাদীস নং ১১১৭

যদি অনন্য বক্তব্য থেকে শরঈ ইঙ্গিত অনুযায়ী এ অর্থ বুঝা যায় তবে তা বাহ্যিক অর্থ থেকে দূরে যাওয়া হবে না, আহলে তা'তীলদের তাবিলের মতোও তাবিল করা হবে না, অতএব তা আহলে সুন্নতের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে দাঁড়াবে না।

উল্লিখিত অভিমত ব্যক্তকারী যা বললেন, তা ফেলে দেওয়ার মতো না। তবে প্রথম কথাটি অধিক পরিষ্কার, ত্রুটিমুক্ত এবং সালাফদের মাযহাবের অধিক উপযোগী।

শরঈ ইঙ্গিতের যে কথাটি বলা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন শুধু হাঁটার সঙ্গেই বিশিষ্ট নয়, বরং বলা হবে যে হাদীসটি একটি উদাহরণতুল্য। কোনটি ইবাদত এবং কোনটি ইবাদত নয়, তা নির্দিষ্ট করার জন্য হাদীসটি উল্লিখিত হয়নি। অতএব হাদীসটির অর্থ হবে: যে ব্যক্তি আমার কাছে এমন ইবাদতের ক্ষেত্রে হেঁটে আসল যাতে হাঁটার প্রয়োজন পড়ে, যেমন জামাতের সঙ্গে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের যাওয়ার প্রয়োজনে হাঁটতে হয়, অথবা এমন ইবাদত যা মূলত হেঁটেই সম্পন্ন করতে হয়, যেমন তাওয়াফ এবং সাঈ।

আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম জ্ঞানী।

ত্রয়োদশ উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا مَٰلِكُونَ ٧١ ﴾ [يس: ٧١]

> তারা কি দেখেনি, আমার হাতের কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। *(সূরা ইয়াসীন: ৩৬: ৭১)*

আমরা এ আয়াতের উত্তর দেব প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে, এ আয়াতের প্রকাশ্য ও প্রকৃত অর্থ কি? প্রকাশ্য ও প্রকৃত অর্থ নির্ধারিত হওয়ার পরেই তো এটা বলা শুদ্ধ হতে পারে যে তা প্রকাশ্য ও প্রকৃত অর্থ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এটা কি বলা হবে যে এ আয়াতের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা চতুষ্পদ জন্তু তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবে যেভাবে তিনি আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন?

না কি বলা হবে যে, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেভাবে যেভাবে তিনি অন্যান্য সৃষ্টিবস্তুকে

সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তিনি তার হাত দিয়ে তা সরাসরি সৃষ্টি করেননি, বরং হাতকে এখানে কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্য যে হাতের যিনি মালিক তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। আর এটা আরবী ভাষায় একটি স্বীকৃত একটি বিষয়।

প্রথম কথাটি আয়াতের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ হতে পারে না দু’ কারণে:

প্রথমত: আরবী ভাষার দাবি অনুযায়ী প্রথম কথাটি আয়াতের শব্দমালার দাবি হতে পারে না। আপনি যদি নিম্নবর্ণিত কয়েকটি আয়াত অনুধাবন করে দেখেন তবে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠ ﴾ [الشورا: ٣٠]

> আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন। *(আশশুরা: ৪২: ৩০)*

﴿ ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١ ﴾ [الروم: ٤١]

মানুষের হাতের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। *(সূরা আররুম: ৩০: ৪১)*

﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيكُمۡ﴾ [ال عمران: ١٨٢]

এ হল তোমাদের হাত যা আগাম পেশ করেছে। *(সূরা আলে ইমরান: ৩: ১৮২)*

এসব আয়াতে মানুষের হাত যা উপার্জন করেছে বা হাত যা আগাম পেশ করেছে দ্বারা স্বয়ং মানুষ যা উপার্জন করেছে বা আগাম পেশ করেছে বুঝানো হয়েছে। হোক তা হাত দ্বারা অথবা অন্যভাবে। এর বিপরীতে যদি বলা হয় যে, এ কাজটি আমি আমার দু'হাত ব্যবহার করে করেছি, তাহলে এর অর্থ হবে কেবল ওই কাজ যা হাত ব্যবহার করে করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে:

﴿ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٩]

সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', যাতে

তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। *(সূরা আল বাকারা: ২: ৭৯)*

এখানে ‘নিজ হাতে কিতাব লিখে’ দ্বারা সরাসরি হাত ব্যবহার করে কিতাব লিখাকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এখানে যদি উদ্দেশ্য এটাই হত যে, আল্লাহ তা‘আলা সরাসরি তাঁর হাত দ্বারাই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তাহলে বাক্যটি এমন হতো : خلقنا لهم بأيدينا أنعاما (অর্থাৎ আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি আমার হাত দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু) যেমন আল্লাহ তা‘আলা আদম আ. এর ব্যাপারে বলেছেন:

﴿ قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ﴾ [ص: ٧٥]

আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলীস, আমার দু’হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? *(সূরা সাদ: ৩৮: ৭৫)*

কারণ আল কুরআন অস্পষ্ট নয় বরং সুস্পষ্ট বর্ণনা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: ٨٩]

আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি
বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনাস্বরূপ। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ৮৯)*

অতএব এ আলোচনার দ্বারা প্রথম কথাটির বাতুলতা প্রকাশিত হয়ে গেল, দ্বিতীয় কথাটি যে সঠিক তা প্রমাণিত হয়ে যায়। আর তা হলো: আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তুকে ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন অন্য মাখলুকাতকে। অর্থাৎ তিনি তাঁর হাত দিয়ে সরাসরি সৃষ্টি করেননি। তবে কর্মকে হাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা কর্মকে সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মতোই। অতএব আল্লাহ তা'আলার বাণী, **'আমার হাতের কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি'** এর অর্থ **'আমার সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি'**। আরবী ভাষার ব্যবহাররীতি এটাই দাবি করে। তবে যদি আরবী ভাষায় يد (হাত) শব্দের পূর্বে بـ **অব্যয়** থাকে তবে সে সময় সরাসরি হাতই অর্থ হয়ে থাকে। এই পার্থক্যকে জেনে রাখুন। কারণ, এ সাদৃশ্যময় বিষয়সমূহের মধ্যে থাকা পার্থক্য জানা উত্তম ইলমের মধ্যে শামিল। এর দ্বারা অনেক প্রশ্ন সমাধান হয়ে যায়।

চতুর্দশ উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ﴾ [الفتح: ١٠]

আর যারা তোমার কাছে বাই‘আত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই‘আত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। *(সূরা আলা ফাতহ: ৪৮: ১০)*

উত্তর:

এর উত্তরে বলা হবে যে, এ আয়াতটি দুটি বাক্য শামিল করে আছে। প্রথম বাক্যটি হলো:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]

আর যারা তোমার কাছে বাই‘আত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই‘আত গ্রহণ করে। *(সূরা আল ফাতহ:৪৮ ১০)*

সালাফ অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত আয়াতটিকে বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থেই নিয়েছেন। অর্থাৎ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই সরাসরি বাই‘আত গ্রহন করেছিলেন। এ কথাটি

নিম্নোক্ত আয়াতেও স্পষ্ট:

﴿ ۞لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল। *(সূরা আল ফাতহ: ৪৮: ১৮)*

আর-

﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]

তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'আত গ্রহণ করে। *(সূরা আল ফাতহ: ৪৮: ১৮)*

আল্লাহ তা'আলার এ কথা থেকে কেউ এটা বুঝে না যে, সাহাবীগণ সরাসরি আল্লাহর কাছেই বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। কেউ এটা বলবে না যে সরাসরি আল্লাহর কাছে বাই'আত গ্রহণ করাই এ আয়াতের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থ, কেননা এরূপ হলে তা আয়াতের প্রথমাংশ ও বাস্তবতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আয়াতের প্রথম অংশে এটা স্পষ্ট করেছেন যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতেই সরাসরি বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলের কাছে বাই'আত গ্রহণ করাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছেই বাই'আত গ্রহণ করা এ জন্যে বলেছেন যে, রাসূল হলেন আল্লাহ তা'আলারই রাসূল যার হাতে সাহাবীগণ আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। আর রাসূলকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর পথে জিহাদ করার উদ্দেশে রাসূলের কাছে বাই'আত গ্রহণ করা প্রকারান্তরে তাঁর কাছেই বাই'আত গ্রহণ করা। কেননা তিনি তো তাঁর পক্ষ থেকে বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্যই রাসূল। অনুরূপভাবে রাসূলের আনুগত্য করা যিনি রাসূলকে পাঠিয়েছেন তারই আনুগত্য করা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ ﴾ [النساء: ٨٠]

যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। *(সূরা আন্-নিসা: ৪: ৮০)*

আর রাসূলের কাছে সাহাবীগণের বাই'আতকে আল্লাহর কাছে বাই'আত বলার মধ্যে নিহিত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করা, তাঁকে সমর্থন করা, কৃত বাই'আতকে জোরদার করা, বাই'য়াতের আযমতকে বাড়িয়ে দেওয়া এবং বাই'আতকারীদের শানকে বাড়িয়ে দেওয়া। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত স্পষ্ট এবং কারও কাছেই গোপন নয়।

দ্বিতীয় বাক্য:

﴿يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ﴾ [الفتح: ١٠]

আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। *(সূরা আল ফাতহ: ৪৮: ১০)*

এ বাক্যটিও বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থেই; কেননা আল্লাহ তা'আলার হাত বাই'আতকারীদের হাতের উপর; হাত হলো আল্লাহ তা'আলার একটি সিফাত আর আল্লাহ হলেন আরশের ওপর। অতএব তাঁর হাত বাই'আতকারীদের হাতের ওপরে। এটাই হলো উক্ত বাক্যের বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ। আর এতে আছে এ কথার তাগিদ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাই'আত করা আল্লাহর কাছেই বাই'আত করা। এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে আল্লাহ তা'আলার হাত তাদের হাতের সঙ্গে লেগে থাকবে। যদি বলা হয় যে 'আকাশ আমাদের ওপরে' তাহলে এটা বুঝা যাবে না যে আকাশ আমাদের মাথার সঙ্গে লেঘে আছে, আকাশ আমাদের থেকে দূরে ও বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও উক্ত বাক্যটি বলা শুদ্ধ। অনুরূপভাবে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত করেছিলেন, আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপরে যদিও আল্লাহ তা'আলা মাখলুক থেকে আলাদা এবং তাদের থেকে ঊর্ধ্বে।

'আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপরে।' এখানে 'আল্লাহর হাত'-কে নবীর হাত বলে বুঝার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা দাবি করার কোনো সুযোগও নেই যে এটাই হলো শব্দের বাহ্যিক অর্থ; কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে

'হাত'-কে তাঁর নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে তাঁর হাত তাদের হাতের ওপরে। আর বাই'আত করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত সাহাবীগণের হাতের ওপরে ছিল না, কেননা বাই'আত করার সময় তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করে ধরতেন আর সাহাবীগণ, যেভাবে মুসাফাহা করা হয় সেভাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতকে ধরতেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত তাদের হাতের সঙ্গে থাকত, তাদের হাতের ওপরে থাকত না।

পঞ্চদশ উদাহরণ

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

«يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني»

হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি[38]। -*আল হাদীস।*

হাদীসটি 'সদাচার, সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়ের আওতাধীন রোগী

[38] - মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৯।

দেখার ফজীলত অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

(আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন: হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে: হে আমার রব, আমি কীভাবে আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো রাব্বুল আলামীন? তিনি বলবেন: তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, কিন্তু তুমি তো তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকে তার কাছেই পেতে? হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। সে বলবে, হে আমার রব, আমি আপনাকে কীভাবে খাওয়াব, আপনি তো সৃষ্টিকুলের রব? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে খাবার দিতে তবে তা আমার কাছে পেতে? হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করতে দাওনি। সে বলল: হে আমার রব, আমি আপনাকে কীভাবে পানি পান করাব, আপনি তো রাব্বুল আলামীন? তিনি বলবেন: আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে

তবে তা আমার কাছে পেতে?)

উত্তর:

এর উত্তর হলো, সালাফগণ নিজেদের খেয়ালখুশি মোতাবেক হাদীসটির অর্থে বিকৃতি সাধন না করেই হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। সালাফগণ এ হাদীসটির ঠিক সে ব্যাখ্যাই দিয়েছেন যে ব্যাখ্যা হাদীসটির যিনি বক্তা তিনি দিয়েছেন। অতএব, 'আমি অসুস্থ হয়েছিলাম', 'তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম', আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম', এ কথাগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল', 'যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল', 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিল'। অর্থাৎ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কোনো বান্দার অসুস্থ হয়ে পড়া, আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কোনো বান্দার খাবার চাওয়া, আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কোনো বান্দার পানি পান করতে চাওয়া। আর এ ব্যাখ্যা যিনি দিয়েছেন তিনি খোদ ওই সত্তা যিনি এ কথাগুলো বলেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। অতএব আমরা যদি এখানে অসুস্থ হওয়া, খাবার চাওয়া, পানি পান করতে চাওয়া- যা আল্লাহর দিকে নিসবত করে উল্লেখ করা হয়েছে- তার ব্যাখ্যায়

যদি বলি যে, এখানে মূলত, বান্দার অসুস্থতা, খাবার চাওয়া ও পানি পান করতে চাওয়াকে বুঝানো হয়েছে, তবে এতে বাণীর যে বাহ্যিক অর্থ তা থেকে সরে যাওয়া হবে না; কারণ যিনি এ বাণীগুলো বলেছেন, তিনি নিজে এসবের ব্যাখ্যা এভাবেই দিয়েছেন। যেমন নাকি তিনি শুরুতেই কথাগুলো এভাবেই বলেছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন মানুষকে আগ্রাহান্বিত ও উৎসাহিত করার উদ্দেশে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে বলেন:

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]

কে আছে, যে অল্লাহকে ঋণ দেবে? (সূরা আল বাকারা: ২: ২৪৫)

অতএব উক্ত হাদীসটি তাবিলপন্থীদের বিরুদ্ধে একটি বড় প্রমাণ; কেননা তাবিলপন্থীরা আল্লাহ তা'আলার সিফাত সংবলিত বক্তব্যগুলোকে, কুরআন-সুন্নাহর কোনো প্রমাণ ব্যতীতই, বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নেয়। তারা কিছু অমূলক যুক্তি দাঁড় করিয়ে তাহরীফ তথা অর্থবিকৃতির আশ্রয় নেয়। কেননা সেসব বক্তব্যের উদ্দেশ্য বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তা না হয়ে যদি অন্যকোনো উদ্দেশ্য হতো - অর্থাৎ তারা যেভাবে দাবি করে সেভাবে হতো- তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অথবা তাঁর রাসূল তা বর্ণনা করতেন। যদি সেসব বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হতো - যেমন তারা ধারণা করেছে -তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূল তা বর্ণনা

করতেন যেভাবে উক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন। যদি এসব বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য উপযোগীভাবে নেওয়া আল্লাহর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হতো, তাহলে বলতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহ তা‘আলা এমন সব অগণিত গুণে নিজেকে গুনান্বিত করেছেন যা তাঁর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। আর এটি কখনো সম্ভব হতে পারে না।

উল্লিখিত উদাহরণগুলোর মাধ্যমেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই এ আশায় যে তা অন্যান্য ক্ষেত্রে পথনির্দেশিকার কাজ করবে। অন্যথায়, এক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের নীতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ সিফাত-বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহকে তার বাহ্যিক অর্থেই বহন করা, কোনো বিকৃতিসাধন, বাতিলকরণ, ধরনধারণ নির্ণয়করণ এবং উদাহরণ নির্ণয়করণ ব্যতীতই।

সিফাত-বিষয়ক বক্তব্য সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।

পঞ্চম অধায়

উপসংহার

যদি কোনো প্রশ্নকারী এ প্রশ্ন করে যে: তাবিলপন্থীদের মাযহাব যে বাতিল তা আমরা সিফাত অধ্যায়ে বুঝতে পেরেছি। আর এটা জানা যে আশ'আরী সম্প্রদায় তাবিলপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে কি আশ'আরীদের মাযহাব বাতিল? অথচ বলা হয়ে থাকে যে, মুসলিমদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই আশ'আরী।

যেখানে ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী, আশ'আরীদের অনুসরণীয় আদর্শ, সেখানে তাদের মাযহাব কি করে বাতিল হতে পারে? তাদের মাযহাব কি করে বাতিল হতে পারে, যেখানে তাদের মধ্যে অমুক অমুক আলেম রয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলিমদের ইমামগণ ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণপ্রত্যাশী ছিলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব যে, অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় আশ'আরীদের সংখ্যা এত বিশাল হবে এটি এমন একটি দাবি যা প্রমাণ করার জন্য সূক্ষ্ম পরিসংখ্যান প্রয়োজন।

যদি আমরা মেনেও নিই যে আশ'আরীদের সংখ্যা উল্লিখিত পরিমাণেই

আছে, অথবা তার চেয়েও বেশি, তবু আমরা বলতে পারি না যে তারা ভুল থেকে মুক্ত। কারণ যা ভুলমুক্ত তা হলো মুসলিমদের ইজমা, সংখ্যায় অধিক হলেই ভুলমুক্ত হবে, তা জরুরি নয়। আর মুসলিমগণ প্রাচীনকালে যে বিষয়ে ইজমা করেছেন তা তাবিলপন্থীদের বিপরীত। সালাফে সালেহীন যারা এই উম্মতের পুরোভাগে ছিলেন - যেমন সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন এবং তৎপরবর্তী হিদায়েতের দিশারি ইমামগণ তারা সকলেই এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য যে নাম ও সিফাতসমূহ সাব্যস্ত করেছেন, অথবা আল্লাহ তা'আলার জন্য তাঁর রাসূল যেসব নাম ও সিফাতসমূহ সাব্যস্ত করেছেন, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হবে। আর এ সংক্রান্ত মূলবক্তব্যকে আল্লাহর জন্য উপযোগীভাবে তার বাহ্যিক অর্থেই নেওয়া হবে, কোনো বিকৃতিসাধন, বাতিলকরণ, ধরন-ধারণ নির্ধারণকরণ ও উদাহরণ নির্ণয়করণ ব্যতীতই।

আর তারা হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুযায়ী, উত্তম যুগের মানুষ। তাদের ঐকমত্য আবশ্যিকভাবে মান্য প্রমাণ। কেননা তাদের ইজমায় প্রতিফলিত হয়েছে কুরআন-সুন্নাহর দাবি। সিফাত-বিষয়ক মূলবক্তব্যে আলোচনাকালে চতুর্থ নম্বর মূলনীতিতে তাদের ইজমার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী এবং অন্যান্য ইমামগণ নিজেদেরকে

ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং তারা তো দ্বীনের ইমাম বনার মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন নিজেদের কদর যথার্থরূপে বুঝা এবং নিজেদেরকে যথার্থ স্থানে রাখতে পারার কারণেই। তাদের অন্তরে ছিল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের তা'যীম। যার কারণেই তারা ইমাম হওয়ার যোগ্য হয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ [السجدة: ٢٤]

আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। *(সূরা আস্সাজদাহ: ৩২: ২৪)*

আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম আ. সম্পর্কে বলেন:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ ﴾ [النحل: ١٢٠، ١٢١]

নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক উম্মত[৩৯], আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সে ছিল তার নিয়ামতের শুকরকারী। তিনি তাকে বাছাই করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। *(সূরা আন-নাহল: ১৬: ১২০-১২১)*

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পরবর্তীযুগে যারা এসেছে এবং নিজেদেরকে ইমাম আশ'আরীর অনুসারী বলে দাবি করে, তারা মূলত ইমাম আশ'আরীকে যথার্থরূপে অনুসরণ করেনি; কারণ ইমাম আশ'আরীর আকীদা তিনটি পর্যায় দিয়ে অতিক্রম করেছে।

প্রথম পর্যায়: মুতাযিলা মতবাদ পর্যায়: অর্থাৎ ইমাম আশ'আরী চল্লিশ বছর পর্যন্ত মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদ পোষণ করে চলেছেন। এ সময় তিনি মুতাযিলা মতবাদের পক্ষে অন্যদের সঙ্গে বিতর্ক করেছেন। এরপর তিনি মুতাযিলা মতবাদ থেকে ফিরে আসেন এবং মুতাযিলাদের গোমরাহ বলে

---

[৩৯] তিনি উম্মত বা জাতি ছিলেন, এই অর্থে যে, একটি জাতির মাঝে যে সমস্ত গুণাবলি পাওয়া যায়, ব্যক্তি ইব্রাহীমের মাঝেই তা বিদ্যমান ছিল। কারও কারও মতে এর অর্থ 'আদর্শ পুরুষ' ''ইমাম' বা কল্যাণের শিক্ষক।

আখ্যায়িত করে কঠোরভাবে তাদের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করেন।[৪০]

দ্বিতীয় পর্যায়: মুতাযিলা ও আহলে সুন্নতের মাঝামাঝি পর্যায়।

এ পর্যায়ে তিনি আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে কুল্লাব এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেন। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'আশ'আরী এবং তার মতো যারা আছেন তারা হলেন সালাফ এবং জাহমিয়াদের মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থিত। তারা সালাফদের কাছ থেকে বিশুদ্ধ কথা গ্রহণ করেছেন এবং জাহমিয়াদের কাছ থেকে যুক্তিভিত্তিক মতবাদসমূহ গ্রহণ করেছেন, যা তাদের কাছে বিশুদ্ধ বলে মনে হতো, কিন্তু আসলে তা ছিল অশুদ্ধ।'[৪১]

তৃতীয় পর্যায়: আহলে সুন্নতের মতাদর্শ আপন করে নেয়ার পর্যায়, যাদের ইমাম হলেন আহমদ ইবনে হাম্বল রা.। ইমাম আশ'আরী এ কথাটি তার সর্বশেষ কিতাব الإبانة في أصول الديانة (আল ইবানাহ ফী উসূলিদ্দিয়ানাহ) তে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আশ'আরী র. এ কিতাবের ভুমিকায় বলেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্মানিত কিতাব নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন। যে কিতাবের আগে-পিছে কোনো বাতুলতা আসে না। যা

---

৪০ - শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড. ৪, পৃষ্ঠা. ৭২

৪১ - মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ১৬, পৃ. ৪৭১

প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যে কিতাবে পূর্বের সকল ইলম একত্র হয়েছে। যে কিতাব দ্বারা দ্বীন ও অবশ্য পালনীয় বিধানসমূহ পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। আর তা আল্লাহ তা'আলার সরল পথ। শক্ত রজ্জু। যে এ কিতাবকে আঁকড়ে ধরবে সে নাজাত পাবে। আর যে তার বিপক্ষে যাবে সে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ হয়ে যাবে, অজ্ঞতায় নিপতিত হবে। আর আল্লাহ তা'আলা তার এ কিতাবে রাসূলের সুন্নত আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧]

রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও। *(সূরা আল হাশর ৫৯: ৭)*

ইমাম আশ'আরী র. তাঁর ভুমিকায় আরো বলেছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নিজের আনুগত্য করার। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর কিতাব অনুযায়ী আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যারা ভাগ্যহারা, শয়তান যাদের ওপর চড়াও হয়েছে, তারা আল্লাহর নবীর সুন্নতকে পেছনে ছুড়ে মেরেছে, পরিত্যাগ করেছে। তারা তাদের কিছু পূর্বসূরির প্রতি ধাবিত হয়েছে যাদের মতাদর্শ তারা অন্ধভাবে মেনে অনুসরণ করেছে, যাদের

দ্বীনকে তারা নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তারা রাসূলের সুন্নতকে বাতিল করে দিয়েছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটনা করতে গিয়েই এরূপ করেছে। অতএব কুরআনের ভাষায় (তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।) *(সূরা আন-আনআম: ৬: ১৪০)*

এরপর ইমাম আশ‘আরী র. বিদআতপন্থীদের একটি নীতির কথা উল্লেখ করেন এবং তা বাতিল বলে ইঙ্গিত করেন। তারপর তিনি বলেন:

‘যদি কেউ আমাকে এ প্রশ্ন করে বলে যে, আপনি তো মুতাযিলা, জাহমিয়াহ, হারুরিয়া, রাফেযা, মুরজিয়াহ- এদের সকলের কথাকে অস্বীকার করলেন। তাহলে আপনার নিজস্ব বক্তব্য এবং আপনি যে মতাদর্শ বহন করেন সে ব্যাপারে কি আমাদের বলবেন?

এ জাতীয় প্রশ্নকারীর উত্তর দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা যে কথা বলি এবং মতাদর্শ বহন করি তা হলো - আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা, আমাদের নবীর সুন্নতকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, হাদীসের ইমামগণ যা বলেছেন তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। আমরা এগুলোকে শক্তভাবে ধরে থাকি। আর আবু আবদুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল- আল্লাহ তার চেহারা উজ্জ্বল করুন, তার দরজা বুলন্দ করুন, তাকে অঢেল প্রতিদানে ভূষিত করুন- যা

বলতেন আমরাও তা বলি। আর যারা তার বিপরীতে যায় আমরা তাদের এড়িয়ে চলি; কেননা তিনি একজন মর্যাদাবান ইমাম ও পূর্ণাঙ্গ নেতা।’

এরপর তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর মাধ্যমে যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য তার প্রশংসা করেন এবং সিফাতসমূহ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া, তাকদীর সম্পর্কে কিছু মাসআলা, শাফাআত এবং কিছু ওহীনির্ভর বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন এবং তিনি তা ওহী ও যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত করেন।

পরবর্তী যুগে যারা এসেছে এবং ইমাম আশ‘আরীর অনুসারী বলে দাবি করেছে তারা তার আকীদাগত জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথাগুলো নিয়েছে এবং সকল সিফাতের ক্ষেত্রে তাবীলের পথ বেছে নিয়েছে। তারা কেবল সাতটি সিফাত আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে যা নিম্নোক্ত কবিতায় সন্নিবিষ্ট:

حـي علـيـم قدير والكلام لــــه   إرادة وكذلك السمع والبصر

অর্থাৎ -চিরঞ্জীব, **সর্বজ্ঞ**, সর্বক্ষমতাবান, কথা, ইচ্ছা, শ্রবণ ও দর্শন।

এ সিফাতগুলো সাব্যস্ত করার ধরণ কি হবে সে ব্যাপারেও আহলে সুন্নত ও

তাদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

আশ'আরিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা উল্লেখ করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন: 'যারা আশ'আরিয়াদের সমালোচনা করেছেন তাদের উদ্দেশ্য হলো ওইসব আশ'আরী যারা আল্লাহ তা'আলার ওইসব সিফাতসমূহকে নাকচ করে দেয় যার সংবাদ কুরআন-সুন্নাহয় এসেছে। আর ইমাম আশ'আরী তাঁর শেষ জীবনে 'আল ইবানা' নামক যে গ্রন্থটি লিখেছিলেন সে গ্রন্থের বক্তব্য যারা মেনে নেয় তারা আহলে সুন্নতের মধ্যে শামিল।' *(মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৫৯)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এর পূর্বে পৃষ্ঠা নং ৩১০-এ বলেছেন: 'আশআরিয়ারা হলো তাদের বিপরীত (অর্থাৎ ইমাম আবুল হাসান আল আশ'আরীর প্রকৃত অনুসারীদের বিপরীত)। তাদের কথা তা'তীল (আল্লাহর সিফাত বাতিল করে দেওয়া)-কে আবশ্যক করে দেয়। তারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা না এ মহাবিশ্বের ভিতরে, না তার বাইরে। তারা বলে যে আল্লাহর সকল কথার অর্থ এক। আয়াতুল কুরসী যে অর্থ ব্যক্ত করে, ঋণ বিষয়ক আয়াতও অভিন্ন অর্থ ব্যক্ত করে। তাওরাত ও ইঞ্জীলও একই অর্থ বহন করে। আর এটা স্পষ্ট বাতিল কথা।'

ইমাম ইবনুল কাইয়েম তার এক কবিতায় বলেন:

واعلم بأن طريقهم عكس الـ ـطريق المستقيم لمن له

عينان

জেনে রাখুন যে তাদের পথ সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে আলাদা

দুচোখ আছে যার তার কাছে।[৪২]

শায়খ মুহাম্মদ আমীন আশশানকিতী তার তাফসীর গ্রন্থ 'আদওয়াউল বায়ান'- এ সূরায়ে আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আরশের ওপরে ওঠা বিষয়ক আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'জেনে রাখুন যে, পরবর্তী যুগের অসংখ্য মানুষ এই বিষয়ে ভুল করেছে। তারা ধারণা করেছে যে, 'ইস্তিওয়া' এবং 'হাত' শব্দের বাহ্যিক যে অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে মাথায় আসে, তা সৃষ্টিজীবের গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। তারা বলেছে যে, 'এ শব্দদ্বয়কে বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে নেওয়া ইজমায়ে উম্মত অনুযায়ী ওয়াজিব।'

তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তির সামান্য আকল-বুদ্ধি আছে, তার কাছে এ কথাটি অত্যন্ত পরিস্কার যে, উল্লিখিত কথার মর্ম হলো, আল্লাহ তা'আলা, আল কুরআনে, নিজেকে এমনসব গুণে গুণান্বিত করেছেন যার তাৎক্ষণিক বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর প্রতি কুফরী করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা

---

[৪২] - আন-নুনিয়াহ, হাররাসের ব্যাখ্যাসহ, পৃ. ৩১২

বলা হিসেবে সাব্যস্ত হয় যা আল্লাহর ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ [النحل: ٤٤]

এবং আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ৪৪)*

সেই নবী এ ব্যাপারে একটি অক্ষরও স্পষ্ট করলেন না, অথচ নির্ভরযোগ্য আলেমদের ইজমা অনুযায়ী, যে সময় কোনো আয়াতের বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে হবে সে সময় থেকে স্পষ্টকরণ প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দেওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জায়েয নয়। আর তা যদি আকীদার ব্যাপারে হয় যার বাহ্যিক অর্থ কুফরী এবং স্পষ্ট গোমরাহী, তবে তো স্পষ্ট করার গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করলেন না, এমনকি পরিশেষে ওইসব অজ্ঞ লোকদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে যারা ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজের ওপর এমন সিফাত আরোপ করেছেন যার বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি অব্যক্ত রেখে গেলেন যে, এ বাণীগুলোর বাহ্যিক অর্থ কুফরী ও গোমারাহী। এটা কিছুতেই হতে পারে না। অতএব তারা যা করেছে তা কেবলই খেয়াল-খুশি

মুতাবেক করেছে, তারা এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর আশ্রয়ে যায়নি। এটা এক মিথ্যাচার যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। এটা সবচেয়ে বড় গোমারাহী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর চরম মিথ্যাচার।

যে ব্যক্তির সামান্যতম আকলবুদ্ধি আছে, সে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করে না যে, প্রত্যেক ওই গুণ যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজেকে গুণান্বিত করেছেন, অথবা যা দ্বারা রাসূল তাঁকে গুণান্বিত করেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমানও রয়েছে, এ গুণগুলো শোনামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে তার মাথায় যে বিষয়টি আসে তা হলো আল্লাহ তা'আলার গুণকে মাখলুকের গুণের সাদৃশ্যতা থেকে পবিত্র মনে করে বাহ্যিক অর্থটাকে বুঝা। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টবস্তু থেকে সত্তায় ও গুণে সম্পূর্ণ আলাদা, এ বিষয়টি কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? না, পারে না। যারা সত্যকে অমান্য করে তারা ব্যতীত এ বিষয়টিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

আর ওই অজ্ঞ মিথ্যাচারী ব্যক্তি, যে মনে করে যে, সিফাত-বিষয়ক আয়াতের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্যে উপযোগী নয়; কেননা তা তার কাছে কুফরী ও তাশবীহ (মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্যকরণ), সে এরূপ কথা এ জন্য বলতে পেরেছে যে, তার অন্তর খালেক ও মাখলুকের মধ্যে সাদৃশ্যকরণের পঙ্কিলতায় নাপাক হয়ে আছে। তাই সাদৃশ্যকরণের আপদ তাকে আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করার দিকে নিয়ে গেছে। আল্লাহর সিফাতের প্রতি ঈমান

না আনার দিকে নিয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেকে এসব গুণে গুণান্বিত করেছেন। অতএব এই জাহেল প্রথমে নিজে মুশাবিবহ তথা সাদৃশ্যকারী হয়েছে, এবং পরবর্তীতে মু'আত্তিল তথা আল্লাহর সিফাত বাতিলকারী হয়েছে। অতএব আল্লাহর জন্য যা উপযোগী নয়, এমন কথা বলার পাপে সে শুরুতে যেমনি শেষেও তেমনি, জড়িয়ে পড়েছে। যদি তার অন্তর যথার্থরূপে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে পারত। আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থরূপে তা'যীম করতে জানত, তাহলে সে তাশবীহ (সাদৃশ্যকরণ) এর পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পবিত্র করে নিত। সে আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক বাণীসমূহের বাহ্যিক অর্থকে মাখলুকের সঙ্গে সকল সাদৃশ্যতা থেকে ঊর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করত এবং তার অন্তর কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আল্লাহ তা'আলার সকল সিফাতে কামালের প্রতি ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত থাকত। পাশাপাশি সে আল্লাহর সকল গুণকে মাখলুকের গুণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবা থেকে পবিত্র থাকত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

তাঁর মত কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(আশশূরা: ৪২: ১১)*[৪৩]

৪৩- তাফসীর আদওয়াউল বায়ান, ২/৩১৯।

আর ইমাম আবুল হাসান আল আশ‘আরী র. তার শেষ জীবনে, আহলে সুন্নত ও আহলে হাদীসের মাযহাবের ওপর ছিলেন। আর তা হলো আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের জন্য যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছেন অথবা রাসূলের মাধ্যমে যেসব সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, সেসব সিফাতকে কোনো বিকৃতি সাধন, বাতিলকরণ, ধরন-ধারণ নির্ধারণকরণ এবং উদাহরণ নির্ণয়করণ ব্যতীতই মেনে নেওয়া। আর মানুষের মাযহাব হলো সেটা যা সে শেষ জীবনে লালন করে, যদি তার কথা এ ব্যাপারে পরিষ্কার থাকে যে, এর বাইরে তার কোনো বক্তব্য নেই, যেমনটি করেছেন আবুল হাসান আশ‘আরী র.। ‘আল ইবানা’ গ্রন্থে থাকা আশ‘আরী এর বক্তব্য থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি। অতএব পরিপূর্ণরূপে ইমাম আশ‘আরী র. এর অনুসরণ করতে হলে তিনি তার জীবনের শেষ ভাগে যার ওপর ছিলেন তার অনুসরণ করতে হবে। আর তা হলো আহলে সুন্নত ও আহলে হাদীসের মাযহাব অনুসরণ করা। কেননা এটাই হলো সঠিক মাযহাব যার অনুসরণ ইমাম আবুল হাসান আল আশ‘আরী র. করেছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

দু‘ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়:

প্রথমত: সত্যকে ব্যক্তি দিয়ে মাপা হয় না, বরং ব্যক্তিকে সত্য দিয়ে মাপা হয়। আর এটাই হলো সঠিক মানদণ্ড। যদিও কোনো ব্যক্তির কথা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে তার অবস্থান ও পদমর্যাদার প্রভাব থাকে, সে হিসেবে ন্যায়বান ব্যক্তির কথা মেনে নেওয়া হয়, পক্ষান্তরে যে ফাসিক তার কথা মেনে নেওয়া হয় না। তবে এটা সর্বাবস্থায় মানদণ্ড হিসেবে খাটে না। কেননা মানুষ তো মানুষই। তারা পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়। পরিপূর্ণরূপে বুঝতে তারা কখনো ব্যর্থ হয়। কখনো এমন হয় ব্যক্তি খুব ধার্মিক, চরিত্রবান কিন্তু তার জ্ঞান অপূর্ণ, তার বুঝার ক্ষমতা দুর্বল। অথবা সে বিশেষ পদ্ধতিতে বড় হয়েছে, অথবা বিশেষ মাযহাবের ওপর বড় হয়েছে এবং সে অন্যকোনো মাযহাবকে জানে না। অতঃপর সে মনে করে যে, সে যা জানে তার মধ্যেই সত্য সীমিত।

দ্বিতীয়ত

আশ‘আরী মতবাদপন্থী আলেমদেরকে যদি সালাফপন্থী আলেমদের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, সালাফপন্থী আলেমগণ অধিক মর্যাদাবান, হিদায়েত ও সত্য পথে অধিক পরিচালিত; কেননা চার মাযহাবের চার ইমাম, যাদের মাযহাবকে অনুসরণ করা হয়, তারা আশ‘আরীপন্থী ছিলেন না।

আর যদি আপনি চার ইমামকে অতিক্রম করে আরো ওপরে যান তবে দেখতে পাবেন যে, তাবে‘ঈগণের কেউই আশ‘আরীপন্থী ছিলেন না।

যদি আপনি আরো ওপরে সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে যান তবে দেখতে পাবেন তাদের কেউই আল্লাহর নাম ও সিফাতের ক্ষেত্রে পরবর্তী যুগের আশ‘আরীপন্থীরা যে মতাদর্শ পোষণ করে তা পোষণ করতেন না।

আমরা অস্বীকার করি না যে, আশ‘আরীপন্থী কিছু আলেম এমন আছেন ইসলামে যাদের অবস্থান খুব সুসংহত। ইসলাম প্রতিরক্ষা, আল্লাহর কিতাবের যত্ন নেয়া, সুন্নতের সার্বিক যত্ন নেয়া, মুসলিমদের হিদায়েত ও উপকার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কাজ করে যাওয়ার বিষয়ে যাদের ভূমিকা স্বীকৃত। কিন্তু এর আবশ্যিক দাবি হিসেবে এটা আসে না যে, তারা ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে এবং তাদের সকল কথাই গ্রহণযোগ্য। পাশাপাশি এটাও আবশ্যক নয় যে, তাদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া যাবে না এবং সত্যকে বয়ান করা যাবে না অথবা মানুষকে সঠিক পথ দেখানো যাবে না।

আমরা এটাও অস্বীকার করি না যে কিছু আলেমের কাছে সঠিক ধারণা অস্পষ্ট থাকার ফলে, সদিচ্ছাবশতই তাদের মতাদর্শ লালন করে যাচ্ছেন। তবে কথা হলো, কোনো বক্তব্যকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য, বক্তার সদিচ্ছা থাকাটাই মূল বিষয় নয়। বরং এক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হলো বক্তার

বক্তব্য শরীয়তসম্মত হওয়া। আর যদি শরীয়তসম্মত না হয় তবে বক্তা যেই হোন না কেন, তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করলো যে ব্যাপারে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।[88]

এরপর যদি বক্তা এমন হন যিনি কল্যাণকামী ও সত্যানুসন্ধানে ঐকান্তিক হওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ, তাহলে সে যে সত্যের বিপরীতে কথা বলছে, সে ব্যাপারে তাকে অপারগ মনে করা হবে। এর অন্যথা হলে তার অসৎ ইচ্ছা এবং সত্যের বিরোধিতার কারণে সে যে ধরনের আচরণের উপযোগী তার সঙ্গে সে ধরনের আচরণই করা হবে।

তাবিলকারীদের বিধান

যদি কোনো প্রশ্নকারী বলে যে, আপনারা কি তাবিলপন্থীদের কাফির বা ফাসিক বলেন? তাহলে এর উত্তরে বলব যে, কাউকে কাফির বা ফাসিক

[88] - বর্ণনায় বুখারী, কিতাবুল ইতিসাম, অনুচ্ছেদ শিরোনাম : যখন কেউ ইজতিহাদ করে; মুসলিম কিতাবুল আকযিয়াহ, হাদীস নং (১৭১৮)

হুকুম জারি করার আধিকার আমাদের নেই। তা বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকার। অতএব এ জাতীয় হুকুমের উৎস হলো একমাত্র কুরআন-সুন্নাহ। সুতরাং এ ব্যাপারে খুব সতর্কতা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের যাচাই বাছাই করতে হবে এবং এমন ব্যক্তিকে কখনো কাফির বা ফাসিক বলা যাবে না যার কুফরী বা ফিসক কুরআন অথবা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

আর এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যে মুসলিম বাহ্যত আদেল তথা ন্যায়পরায়ণ, তার আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা ততক্ষণ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না যতক্ষণ না শরীয়তের কোনো দলিলের দাবি তা বিলুপ্ত করে দেয়। আর যখন শরীয়তের কোনো দলিল তার আদালত-সততাকে বিলুপ্ত করে দেবে, তখন তাকে কাফির কিংবা ফাসিক বলার ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা দেখানো যাবে না; কাফির কিংবা ফাসিক বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দু'কারনে জরুরি:

এক. এই হুকুমের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর মিথ্যাচারিতা এবং যে ব্যক্তির ওপর কুফরী বা ফিসকের হুকুম লাগানো হলো তার ওপরও মিথ্যাচারিতা।

দুই. যে ব্যক্তির ওপর কুফরী ও ফিসকের হুকুম লাগানো হলো সে যদি প্রকৃত অর্থে কাফের বা ফাসিক না হয়ে থাকে, তা হলে যে হুকুম লাগাল সেই তাতে পতিত হবে। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু

আনহু থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»

যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে হুকুম লাগায়, তবে এ হুকুমটি তাদের দুজনের মধ্যে যেকোনো একজনের প্রতি ফিরে আসবে।[45]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে:

«إن كان كما قال وإلا رجعت عليه»

সে যা বলেছে ওই ব্যক্তি যদি তার উপযোগী হয় তো হলোই, অন্যথায় তা বক্তার প্রতি ফিরে আসবে।

সহীহ মুসলিমে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا

[45] মুসলিম, হাদীস নং ১১১।

حار عليه»

> যে ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তিকে কাফির বলে ডাকল অথবা বলল যে সে আল্লাহর শত্রু, অথচ সে বাস্তবে সে রকম নয়, তাহলে তা বুমেরাং হয়ে তার প্রতিই ফিরে আসবে।[৪৬]

অতএব একজন মুসলিমকে কাফির বা ফাসিক বলে ডাকার আগে দুটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে:

এক. কুরআন অথবা সুন্নাহয় এ ব্যাপারে নির্দেশনা থাকতে হবে যে এই কথাটি বললে বা এই কাজটি করলে অনিবার্যভাবে ব্যক্তি কাফির বা ফাসিক হয়ে যায়।

দুই. সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি, যে কুফরীপূর্ণ অথবা ফিসকপূর্ণ কোনো কথা বলেছে বা এ জাতীয় কোনো কাজ করেছে, তার ওপর এই হুকুমটি বর্তানো। অর্থাৎ কাফির অথবা ফাসিক হওয়ার সকল শর্ত ওই ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত থাকা এবং এ হুকুম লাগানোর পথে কোনো বাধা না থাকা।

---

৪৬ - বর্ণনায় মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদ : ওইব্যক্তির ঈমানের অবস্থা যে তার ভাইকে ‘ হে কাফির’ বলে ডাকল, হাদীস নং (৬১৬০)

যেসব শর্তসমূহ উপস্থিত থাকতে হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ ব্যাপারে ব্যক্তির জ্ঞান থাকা যে, সে যা বলছে বা করছে, তার অনিবার্য পরিণতি হলো কাফির বা ফাসিক হয়ে যাওয়া। এর প্রমাণ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ [النساء: ١١٥]

আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। *(সূরা আন্-নিসা: ৪: ১১৫)*

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ١١٦ ﴾

[التوبة: ١١٥، ١١٦]

> আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোনো সম্প্রদায়কে হিদায়াত দানের পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন। যতক্ষণ না তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, যা থেকে তারা সাবধান থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর জন্যই আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য না আছে কোন অভিভাবক, না আছে কোন সাহায্যকারী। *(সূরা আত্-তাওবাহ: ৯: ১১৫ -১১৬)*

এ কারণেই আলেমগণ বলেছেন: ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি দিনের নয়, এমন কোনো ব্যক্তি যদি ফরজকর্মসমূহ অস্বীকার করে তবে তাকে কাফির বলা হবে না যতক্ষণ না তাকে স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

আর কাফের বা ফাসিক হিসেবে হুকুম লাগানোর পথে যেসব বাধা থাকে তার মধ্যে একটি হলো, অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো পক্ষ থেকে কুফরী বা ফিসক সংঘটিত হওয়া। আর তা কয়েকভাবে হতে পারে:

যেমন: কাউকে কুফরী করতে বাধ্য করা হলো, অতঃপর তার অন্তর ঈমানে ভরপূর থাকা সত্ত্বেও সে বাধ্য হয়ে কুফরী করল। এমতাবস্থায় তাকে কাফির বলে হুকুম দেওয়া হবে না। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার

বাণী:

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦ ﴾ [النحل: ١٠٦]

যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ১০৬)*

আরেকটি বাধা হলো কারও চিন্তাশক্তি থেমে যাওয়া। এমন হয়ে যাওয়া যে, সে কি বলছে বা না বলছে তা অনুভব করতে পারছে না। এটা হতে পারে সীমাতীত খুশির আতিশায্যে, অথবা প্রচণ্ডভাবে চিন্তাগ্রস্ত বা ভীত হয়ে পড়ার কারণে।

এর দলিল সহীহ মুসলিমে আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

(নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তাওবায়, যখন সে তাওবা করে তাঁর কাছে ফিরে আসে, ওই ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন যে মরুভূমিতে তার বাহনের ওপর থাকে, অতঃপর বাহনটি -যার ওপর তার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় ছিল - তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং সে তার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ে। অতঃপর সে একটি গাছের কাছে আসে এবং এর ছায়ায় শুয়ে পড়ে, এ অবস্থায় যে সে তার বাহনটি ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে একেবারে নিরাশ। এরপর সে হঠাৎ করে দেখে যে বাহনটি তার কাছেই দাঁড়ানো। অতঃপর সে তার লাগামটি হাতে নেয় এবং সীমাতীত আনন্দে বলে ওঠে: হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার রব। সে প্রচণ্ড আনন্দের কারণে ভুল করে ফেলে।)[৪৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'কাউকে কাফির বলে হুকুম লাগানোর ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো, যে ব্যক্তি সত্যকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল এবং সদিচ্ছা বহন করল, কিন্তু সে ভুল করল, তাহলে তাকে কাফির বলা হবে না। বরং তার ভুলটিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তবে যে ব্যক্তির সামনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তা স্পষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু সে হিদায়েত স্পষ্ট হওয়ার পরও তার বিরুদ্ধাচরণ করল এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্যপথ অনুসরণ করল,

[৪৭] - বর্ণনায় মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, হাদীস নং (২৭৪৫-২৭৪৭)

তাহলে সে কাফির। আর যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল এবং সত্যানুসন্ধানে শিথিলতা দেখালো এবং অজ্ঞতাবশত কথা বলল, তাহলে সে পাপী, গোনাহগার। এরপর সে হতে পারে ফাসিক অথবা তার পুণ্যের সংখ্যা পাপের চেয়ে অধিক।'[৪৮]

তিনি আরো বলেন, 'অবশ্য আমি সব সময়ই সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাফির, ফাসিক বা গোনাহগার হিসেবে আখ্যায়িত করার ঘোর বিরোধী থেকেছি - যারা আমার কাছে বসে তারা আমার এ অবস্থান সম্পর্কে জানে -। হ্যাঁ, যদি ওই ব্যক্তির ওপর রিসালতের হুজ্জত[৪৯] কায়েম হওয়ার বিষয়টি জানা থাকে, যার বিপক্ষে গেলে মাত্রা বুঝে ব্যক্তি কখনো কাফির, কখনো ফাসিক এবং কখনো গোনাহগার হয়ে যায়, তবে তার কথা আলাদা। আর আমি স্বীকার করি যে, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের ভুলত্রুটি নিশ্চয় ক্ষমা করে দিয়েছেন, হোক তা কথাজাত মাসাইল সংক্রান্ত যা ওহীর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি, অথবা প্রায়োগিক কোনো মাসাইল সংক্রান্ত। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এসব মাসাইল বিষয়ে বিতর্ক অব্যাহত রেখেছিলেন, কিন্তু তাদের কেউ কাউকে কাফির, ফাসিক বা গোনাহগার

---

[৪৮] - মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ১২, পৃ. ১৮০

[৪৯] - রিসালতের হুজ্জত বলতে বুঝায় রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা স্পষ্টরূপে কারো কাছে পৌঁছে দেয়া।

বলে আখ্যায়িত করেননি।'[৫০]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ র. এ ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বলেন: 'আমি এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতাম যে, এই এই বললে কোনো ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে বলে সালাফ ও ইমামগণ যে বক্তব্য দিতেন তাও সত্য। তবে সাধারণভাবে কাফির বলা এবং সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তিকে কাফির বলার মধ্যে পার্থক্য করা অত্যাশ্যক।'

তিনি বলেন: 'তাকফীর তথা কাফির হয়ে যাওয়ার হুকুম লাগানো একটি হুঁশিয়ারি। কারণ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথাকে অস্বীকার করল, হতে পারে যে সে নও-মুসলিম (ইসলামের সঙ্গে যার সম্পর্ক নতুন) অথবা হতে পারে যে সে দূরবর্তী কোনো মরুভূমিতে বড় হয়েছে। এমন ব্যক্তি যদি ইসলামের কোনো কিছু অস্বীকার করে, তাহলে তাকে কাফির বলা হবে না যতক্ষণ না তার ওপর হুজ্জত কায়েম হবে। এমনও হতে পারে যে, ব্যক্তি যেসব বিষয় অস্বীকার করল সেসব বিষয় সংক্রান্ত পবিত্র মূলবক্তব্য সে শোনেনি। অথবা শুনেছে কিন্তু তার কাছে তা প্রমাণিত হয়নি। অথবা ওই সব টেক্সটের বিপক্ষে তার কাছে অন্যকোনো টেক্সট আছে, যার কারণে সে এসব টেক্সটকে তাবিল করেছে, যদিও সে এক্ষেত্রে ভুল করেছে।

[৫০] - মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৩, পৃ. ২২৯

আর আমি সব সময়ই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করতাম যেখানে একব্যক্তি বলেছেন যে: আমি যখন মারা যাব, আমাকে তোমরা জ্বালিয়ে দিও এরপর আমাকে পিশে ফেলিও, এরপর আমাকে সাগরে ছিটিয়ে দিও। আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে সক্ষম হন তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দেবেন যা তিনি এ মহাবিশ্বে অন্যকাউকে দেননি। লোকেরা তার কথামতোই কাজ করল। আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি যা করলে তা কি জন্য করেছ। লোকটি বলল, আপনার ভয়ে আমি এরূপ করেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিলেন।[৫১]

এই লোকটি আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ করেছে। তাকে সাগরে ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ তাকে একত্র করে পুনরায় জীবন দানের ক্ষমতা রাখেন এ ব্যাপারে সে সন্দেহ করেছে। বরং সে বিশ্বাস করেছে যে, সে পুনরুত্থিত হবে না। আর এ ধরণের সন্দেহ বা বিশ্বাস মুসলিমদের ঐক্যমত্য অনুযায়ী কুফরী। তবে লোকটি জাহেল ছিল, এ ব্যাপারে তার জ্ঞান ছিল না। সাথে সাথে সে মুমিন ছিল, সে আল্লাহকে ভয় করত যে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন। আর সে কারণেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে

[৫১] - বুখারী, আহাদীসুল আম্বীয়া অধ্যায়, হাদীস নং (৩৪৭৮); মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, হাদীস নং (২৭৫৬, ২৭৫৭)

দিয়েছেন।

আর যে ব্যক্তি ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে এবং সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের ব্যাপারেও আগ্রহী, সে যদি তাবিল করে তাহলে উল্লিখিত ব্যক্তির চেয়েও ক্ষমা পাওয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার।'

এ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, বক্তব্য ও বক্তা, কর্ম ও কর্মসম্পাদনকারীর মধ্যে পার্থক্য আছে। অতএব যেকোনো কুফরীপূর্ণ বা ফিসকপূর্ণ কথা বা কাজ, বলামাত্র বা করামাত্রই, বক্তা বা কর্মসম্পাদনকারীকে কাফির বা ফাসিক বলা যাবে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. মাজমুউল ফাতাওয়ায় বলেন, 'এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, যে কথাটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুযায়ী কুফরী, সে ব্যাপারে সাধারণভাবে বলা হবে যে তা কুফরী, শরঈ দলিল যেভাবে কুফরী প্রমাণিত করেছে ঠিক সেভাবে; কারণ ঈমান হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে আহরিত বিধানসমূহের একটি। ঈমানের ব্যাপারে মানুষের ধারণা ও খেয়াল-খুশি মুতাবিক হুকুম লাগানো যাবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো কুফরী কথা বলল, সে কাফির হয়ে গিয়েছে এ হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত লাগানো যাবে না যতক্ষণ না কাফির হয়ে যাওয়ার সকল শর্ত তার ওপর বর্তাবে এবং এ বিষয়ক সকল বাধা দূরিভূত হবে।

উদাহরণত, যদি কেউ বলে যে মদ অথবা সূদ হালাল, আর সে ইসলামে নতুন প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, অথবা সে দূরবর্তী কোনো মরুভূমিতে বড় হয়ে থাকে, অথবা সে কোনো একটি বাণী শুলন কিন্তু সে বিশ্বাস করল না যে তা আল কুরআনের বাণী, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এর হাদীস, যেমন সালাফদের কেউ কেউ কোনো কোনো বিষয় অস্বীকার করতেন যতক্ষণ না তাদের কাছে প্রমাণিত হত যে রাসূলুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলেছেন।'[৫২]

এরপর তিনি বলেছেন, এইসব লোকদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির বলা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ওপর রিসালতের হুজ্জত কায়েম হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾ [النساء: ١٦٥]

যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে। *(সূরা আন্-নিসা: ৪: ১৬৫)*

আর আল্লাহ তাআল এ উম্মতের ভুলত্রুটি ও ভুলে যাওয়াকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব বুঝা গেল যে, কথা বা কাজ কখনো কুফরী হয় এবং

[৫২] - মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫, পৃ.১৬৫

কখনো ফিসক। তবে যে ব্যক্তি এহেন কথা বলল বা এ জাতীয় কোনো কাজ করল তার কাফির বা ফাসিক হয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়। হয়তো কাফির বা ফাসিক হওয়ার শর্ত নাকচ হওয়ার কারণে অথবা কোনো শরঈ বাধা আসার কারণে। তবে যারা ইসলাম ব্যতীত অন্যকোনো ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের, এ পৃথিবীতে, কাফের হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তির সম্মুখে সত্য প্রকাশিত হলো কিন্তু সে তার উল্টো চলতে দৃঢ়তা প্রদর্শন করল -কোনো বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যা সে পূর্ব থেকেই বহন করে আসছে, অথবা তার কোনো গুরুর অনুসরণ করতে গিয়ে যাকে সে তা'যীম করে, অথবা দুনিয়ার লোভে- তাহলে সে এই উল্টো চলার কারণে মাত্রা বুঝে কাফির অথবা ফাসিক হয়ে যাবে। অতএব মুমিনের ওপর জরুরি যে, সে তার আকীদা ও আমলকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে। কুরআন-সুন্নাহকে সে তার ইমাম বানাবে যা থেকে সে আলো সংগ্রহ করবে। কুরআন-সুন্নাহর পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবে। এটাই হলো সিরাতে মুস্তাকীম যার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে দিয়েছেন:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣ ﴾

[الانعام: ١٥٣]

> আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। *(সূরা আল আন‘আম: ৬: ১৫৩)*

যারা তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও আমলকে সুনির্দিষ্ট মাযহাবের ওপর স্থিত করেন, তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত যে, তারা যখন কুরআন-সুন্নাহর কোনো মূলবক্তব্য দেখেন যা তাদের মাযহাবের বিপরীত, সেটাকে তারা অনুচিত ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের মাযহাবের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। অতঃপর তারা কুরআন-সুন্নাহকে অনুকরণীয় নয় বরং তাদের মাযহাবের অনুসারী বানিয়ে ফেলেন। কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত যা আছে সেগুলোকে তারা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী বানান না। এটা হলো প্রবৃত্তিপূজারীদের পথ। এটা হিদায়েত অনুসারীদের পথ নয়। এই পথকে আল্লাহ তা‘আলা ভৎর্সনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَٰهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ٧١ ﴾

[المؤمنون: ٧١]

> আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে আসমানসমূহ, জমিন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। *(সূরা আল মুমিনূন: ২৩: ৭১)*

এ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা যে পর্যবেক্ষণ করতে যাবে সে আজব ধরনের বিষয় দেখতে পাবে। সে বুঝতে পারবে যে, হিদায়েত ও সত্যের ওপরে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া একজন বান্দার জন্য কতোই না প্রয়োজন।

আর যে ব্যক্তি সত্য হৃদয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছে নিজের অপারগতা প্রকাশ করবে -আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষিতার ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান রেখে এবং সে যে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী তা অন্তরে অনুভব করে -তাহলে অবশ্যই আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার বান্দার এ প্রার্থনাকে কবুল করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ ١٨٦ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। *(সূরা আল বাকারা: ২: ১৮৬)*

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা সত্যকে সত্য হিসেবে দেখে এবং তার অনুসরণ করে। এবং অসত্যকে অসত্য হিসেবে দেখে এবং তা বর্জন করে চলে। তিনি যেন আমাদেরকে হিদায়েতকারী ও হিদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি যেন আমাদের সৎ ও সংস্কারকারী বানান। তিনি যেন আমাদেরকে হিদায়েত করার পর আমাদের অন্তরকে সত্যচ্যুত না করেন। তিনি যেন আমাদেরকে রহমত দান করেন, নিশ্চয় তিনি সর্বদাতা।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সৃষ্টিকুলে রব। যার অনুকম্পা ও নিয়ামতে সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হয়। আর সালাত ও সালাম

রহমতের নবীর ওপর, যিনি উম্মতকে প্ররাক্রমশালী ও সপ্রংশ আল্লাহ তা‘আলার পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশেই। সালাত ও সালাম তার পরিবারবর্গের প্রতি, সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করবেন তাদের সকলের প্রতি।

১৫ শাওয়াল, ১৪০৪ হি. তারিখে এ বইটি লেখার কাজ সম্পন্ন হলো

আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী

মুহাম্মদ আস-সালেহ আল উসাইমীন।

সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত 'মাজাল্লাতুদ দাওয়াহ'

পত্রিকায় ছাপা প্রবন্ধের কপি[৫৩]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তার কাছে ক্ষমা চাই এবং তার কাছে তাওবা করি। আমাদের নিজ নাফসের খারাবি এবং আমাদের কর্মসমূহের মধ্যে যা অসাধু তা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। যাকে আল্লাহ হিদায়েত দান করেন তাকে গোমরাহকারী কেউ নেই, আর যাকে তিনি গোমরাহ করেন তাকে হিদায়েতকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর সাহাবীগণের প্রতি এবং যারা সততার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন তাদের প্রতি সালাত বর্ষণ করুন এবং

---

[৫৩] - সংখ্যা : (৯১১), তারিখ : ৪/১/১৪০৪ হি., সোমবার।

তাদেরকে উত্তম শান্তিতে ভূষিত করুন।

আমার কিছু মজলিসে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক বান্দার ‘সঙ্গে থাকা’ বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু আমার কথা থেকে কেউ কেউ এমন কিছু বুঝল যা আমার উদ্দেশ্য ছিলনা, যা আমার আকীদাও নয়। ফলে এ ব্যাপারে মানুষের প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা বেড়ে গেল যে, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক মাখলুকের ‘সঙ্গে থাকা’র ব্যাপারে কি বলা হবে?

আমি:

(ক) যাতে কেউ আল্লাহ কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কোনো ভুল বিশ্বাসে নিপতিত না হয়।

(খ) যাতে কেউ আমার ব্যাপারে মিথ্যাচার করতে না পারে, এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, অথবা কোনো ধারণাকারী এমন কথার ধারণা করতে না পারে যা আমি উদ্দেশ্য করিনি।

(গ) আল্লাহ তা‘আলার এই মহান সিফাত যা তিনি নিজের জন্য বেশ কয়েকটি আয়াতে সাব্যস্ত করেছেন, এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা যাতে স্পষ্টভাবে বয়ান করতে পারি তার জন্য আমি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহ উল্লেখ করছি:

প্রথমত: আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ﴾ [الحديد: ٤]

আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। *(সূরা আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ١٢٨ ﴾ [النحل: ١٢٨]

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ১২৮)*

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের কাছে পাঠাবার সময় মূসা ও হারুন আলাইহিমাস্সালামকে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿ قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ٤٦ ﴾ [طه: ٤٦]

তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি'। *(সূরা তাহা: ২০:*

৪৬)

তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলেন:

﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ﴾ [التوبة: ٤٠]

যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, ‘তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। *(সূরা আত-তাওবা: ৪০)*

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت»

সর্বোত্তম ঈমান হলো এই যে, তুমি জানবে যে, তুমি

যেখানেই আছ, আল্লাহ তোমার সাথেই আছেন।[৫৪]

হাদীসটিকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. ‘আল আকীদা আল ওয়াসেতিয়্যা’ গ্রন্থে হাসান বলেছেন। অবশ্য আলেমদের কেউ কেউ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর সাথে আছেন এ কথাটি ইতঃপূর্বে একটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আর সালাফগণও এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন।

দ্বিতীয়ত: এ ‘সঙ্গে থাকা’র বিষয়টি তার যে প্রকৃত অর্থ সে অর্থেই সত্য। তবে তা এমন ‘সঙ্গে থাকা’ যা আল্লাহর জন্য উপযোগী এবং যা এক মাখলুক কর্তৃক অন্য মাখলুকের সঙ্গে থাকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়; কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজ সম্পর্কে বলেছেন:

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾ [الشورى: ١١]

তাঁর মত কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা আশ্-শূরা: ৪২: ১১)*

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

---

[৫৪] - তাবারানী, আল আওসাত (৮৮/৩৩৬), হাদীস নং ৮৭৯৬

﴿هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥﴾ [مريم: ٦٥]

তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান? *(সূরা মারইয়াম: ১৯: ৬৫)*

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [الاخلاص: ٤]

আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই। *(সূরা আল ইখলাস: ১১২: ৪)*

‘সঙ্গে থাকা’র সিফাত অন্যান্য সিফাতের মতোই প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত, আল্লাহর ক্ষেত্রে যেভাবে উপযোগী সেভাবে। আর তা মাখলুকের সিফাতের সাথে সাদৃশ্যবিহীন।

ইবনে আবদুল বার বলেছেন, ‘আহলে সুন্নত কুরআন-সুন্নাহয় উল্লিখিত সকল সিফাতের ওপর ঈমান আনা এবং সেগুলোকে রূপক অর্থে নয় বরং প্রকৃত অর্থে বহন করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে তারা এ সিফাতসমূহের কোনোটারই ধরন-ধারণ কি বা বাস্তবতা কি তা উল্লেখ

করেন না।[৫৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া আল ফাতওয়া আল হামাবিয়ায় বলেন, ‘কোনো ধারণাকারী এটা ধারণা করতে পারে না যে, কুরআন সুন্নাহয় যা এসেছে তার একটির সঙ্গে অপরটির সংঘর্ষ হতে পারে। যেমন কেউ বলল যে, আল্লাহর কিতাবে ও রাসূলের সুন্নাহয় আল্লাহ তা‘আলার আরশের ওপরে থাকার যে কথা এসেছে, তার বাহ্যিক অর্থ নিম্নোক্ত আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ﴾ [الحديد: ٤]

আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। *(সূরা আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

অথবা নিম্নবর্ণিত হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, আর তা হলো:

«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»

যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ

---

[৫৫] - ইমাম ইবনুল বারর এর বরাত দিয়ে এ কথাটি ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার গ্রন্থ আল ফাতওয়া আল হামুবিয়াতে উল্লেখ করেন, দ্রঃ মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৫, পৃ. ৮৭.

তা‘আলা নিশ্চয় তাঁর সম্মুখেই থাকেন।

এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস।

এরকম মনে করাটা ভুল; কারণ আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে আছেন এবং তিনি আরশের ওপরও প্রকৃত অর্থে আছেন। আল্লাহ তা‘আলা এ উভয় বিষয়কে নিম্নবর্ণিত আয়াতে একত্র করে উল্লেখ করেছেন:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ ﴾ [الحديد: ٤]

তিনিই আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন। তিনি জানেন জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার

সম্যক দ্রষ্টা। *(আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

এখানে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে তিনি আরশের ওপরে আছেন এবং প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসুল আওআলে বলেছেন:

«والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه»

আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপরে, তবে তোমরা যে অবস্থায় আছ সে ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত।[৫৬]

এর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, আরবী ভাষায় مع (সঙ্গে) শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন এর বাহ্যিক অর্থ হয় সাধারণভাবে তুলনা করা, যা আবশ্যিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ অথবা একে অন্যের ডানে বা বামে থাকাকে দাবি করে না। যদি 'সঙ্গে থাকা'র অর্থকে বিশেষ কোনো অর্থে সীমিত করে উল্লেখ করা হয়, তবে তা সে বিশেষ অর্থ-কেন্দ্রিক তুলনাকে বুঝাবে। বলা হয় যে, আমরা এখনও চলছি আর চাঁদ আমাদের সঙ্গে, অথবা তারকা আমাদের সঙ্গে। আরও বলা হয় যে 'এ বস্তুটি আমার সঙ্গে' যদিও তা

---

[৫৬] - এ হাদীসটির উৎস বর্ণনা পূর্বে গিয়েছে।

আপনার মাথার ওপরে। কেননা আপনার উদ্দেশ্য হলো এ বস্তুর সঙ্গে আপনার স্পৃক্ততা বয়ান করা। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও প্রকৃত অর্থেই তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন যদিও তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর আরশের ওপরে আছেন।)[৫৭]

তৃতীয়ত: আল্লাহ কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার দাবি হলো, তিনি তাঁর ইলম ও ক্ষমতায়, শ্রবণ ও দর্শনে, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে মাখলুককে পরিবেষ্টন করে আছেন। যদি 'সঙ্গে থাকা' বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গুণকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত না হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْۚ﴾ [الحديد: ٤]

আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। *(আল হাদীদ: ৫৭: ৪)*

﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْۖ﴾ [المجادلة: ٧]

[৫৭] - মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড ৫, পৃ. ১০২

তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সংগেই আছেন। *(সূরা আল মুজাদালা: ৫৮: ৭)*

আর যদি 'সঙ্গে থাকা'র বিষয়টি বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গুণকে কেন্দ্র করে উল্লিখিত হয়, তখন উল্লিখিত অর্থগুলোর সঙ্গে যোগ হবে- সাহায্য সহযোগিতা করা, তাওফীক দেওয়া এবং সঠিক পথ দেখানো।

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে থাকার উদাহরণ হলো মূসা ও হারূন আলাইহিমাস্ সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার কথা:

﴿لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ٤٦﴾ [طه: ٤٦]

আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি। *(সূরা তাহা: ২০: ৪৬)*

﴿لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ﴾ [التوبة: ٤٠]

তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। *(আত-তাওবা: ৪০)*

বিশেষ কোনো গুণের সঙ্গে থাকার উদাহরণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٤٦﴾ [الانفال: ٤٦]

আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। *(সূরা আল আনফাল: ৪৬)*

আল কুরআনে এ জাতীয় আরো বহু উদাহরণ রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. 'ফাতওয়া আল হামাবিয়া'তে বলেন, 'প্রসঙ্গের ভিন্নতা অনুযায়ী 'সঙ্গে থাকা'র ভিন্ন ভিন্ন হুকুম হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ তা'আলা যখন বলেন:

﴿يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٤﴾ [الحديد: ٤]

তিনি জানেন জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। *(আল*

হাদীদ: ৪)

এই বাণীর বাহ্যিক অর্থ যা নির্দেশ করছে তা হলো, এই ‘সঙ্গে থাকা’র হুকুম ও দাবি হলো, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত, তিনি তোমাদের ওপর সাক্ষী এবং তিনি তোমাদের ওপর আধিপত্যকারী ও তোমাদের ব্যাপারে জ্ঞানী। এটাই হলো সালাফদের কথার অর্থ যে: তিনি তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর এটাই হলো উল্লিখিত বাণীর বাহ্যিক ও প্রকৃত অর্থ। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের গুহায় তাঁর সাথীকে বললেন: ‘তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন’ তখন এটাও তার বাহ্যিক অর্থেই এবং অবস্থার পারিপার্শ্বিকতা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে ‘সঙ্গে থাকা’র অর্থ সম্যকভাবে অবহিত থাকা, সাহায্য-সহযোগিতা করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ۝١٢٨ ﴾ [النحل: ١٢٨]

> নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ১২৮)*

অনুরূপভাবে মূসা ও হারূন আলাইহিমাস্ সালামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ

তা'আলার বাণী:

﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ۝٤٦ ﴾ [طه: ٤٦]

ভয় করোনা, আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি'। *(সূরা তাহা: ২০: ৪৬)*

এখানে 'সঙ্গে থাকা' বাহ্যিক অর্থেই। আর এসব স্থলে সঙ্গে থাকার অর্থ হলো: সাহায্য-সহযোগিতা।

পরিশেষে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, 'সঙ্গে থাকার অর্থ ও তার চাহিদার মধ্যে পার্থক্য আছে। আর হতে পারে যে, যা সঙ্গে থাকার চাহিদা তাই তার অর্থ, যা স্থানভেদে ভিন্ন হয়।'[৫৮]

মুহাম্মাদ ইবনুল মুওসিলী ইমাম ইবনুল কাইয়েম র. এর গ্রন্থ استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة এর নবম উদাহরণে (পৃষ্ঠা নং ৩০৯) বলেন: مع (সঙ্গে) শব্দটি যে অর্থ বুঝায় তা হলো সঙ্গ দেওয়া, সম্মতি জ্ঞাপন করা। অতএব যদি সাধারণভাবে বলা হয় যে, আল্লাহ তাঁর মাখলুকের সঙ্গে আছেন, তবে এর দাবিগত আবশ্যিক অর্থ হবে, তিনি তাঁর মাখলুক বিষয়ে সম্যক অবহিত, তিনি তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করছেন এবং

---

[৫৮] - মাজমুউল ফাতাওয়া, পৃ. ১০৩

তিনি তাদের ওপর ক্ষমতাবান। আর যদি বিশেষভাবে বলা হয়, যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ ۝١٢٨ ﴾ [النحل: ١٢٨]

> নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ১২৮)*

তাহলে তার দাবিগত আবশ্যিক অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনদানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন।

অতএব আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর বান্দার সঙ্গে থাকা দুই প্রকার: সাধারণভাবে সঙ্গে থাকা এবং বিশেষভাবে সঙ্গে থাকা। আর আল কুরআনে উভয় প্রকারের কথাই উল্লিখিত রয়েছে।

ইমাম নববী রচিত 'চল্লিশ হাদীস' গ্রন্থের ঊনিশ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে রজব র. বলেন যে, 'বিশেষভাবে সঙ্গে থাকার দাবি হলো, আল্লাহ তা'আলা সাহায্য, সমর্থন, সুরক্ষা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সঙ্গে থাকেন। আর সাধারণভাবে সঙ্গে থাকার অর্থ আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান, অবগত থাকা এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে থাকেন।'

ইমাম ইবনে কাছীর র. সূরায়ে মুজাদালায় 'সঙ্গে থাকা বিষয়ক'

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,‘এ কারণেই একাধিক আলেম এ ব্যাপারে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন যে, এখানে সঙ্গে থাকার অর্থ ‘জ্ঞানের মাধ্যমে সঙ্গে থাকা’। এ অর্থ নেওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত। তবে জ্ঞান ও দৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা তার মাখলুকের সঙ্গে থাকার পাশাপাশি তিনি শ্রবণের মাধ্যমেও তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন। অতএব আল্লাহ তা‘আলা তার সৃষ্টিকুল সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত এবং তাদের কোনো কিছুই তাঁর কাছে অদৃশ্য নয়।’

চতুর্থত: আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের ‘সঙ্গে থাকা’ এটা দাবি করে না যে তিনি তাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন, অথবা তিনি তাদের স্থানে অবস্থান করছেন। এটা কোনোভাবেই বোঝায় না। কেননা এ জাতীয় অর্থ বাতিল অর্থ যা আল্লাহর ক্ষেত্রে কিছুতেই প্রযোজ্য নয়। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী এমন অর্থবোধক হতে পারে না যা আল্লাহর ক্ষেত্রে কিছুতেই প্রযোজ্য হতে পারে না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. তাঁর ‘আল আকীদা আল ওয়াসেতিয়া’ গ্রন্থে বলেছেন,‘তিনি তোমাদের সাথে আছেন’ এর অর্থ এটা নয় যে তিনি মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন। ভাষার ব্যবহার পদ্ধতি এ অর্থকে আবশ্যক করে না। বরং চাঁদ আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এবং তার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে ছোট্ট একটি সৃষ্টি। চাঁদ আকাশে স্থাপিত এবং তা মুসাফির এবং অমুসাফির সবার সঙ্গেই আছে, সে যেখানেই থাক না

কেন।’

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সত্তাসহ মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন বা মাখলুকের সঙ্গে অবস্থান করছেন এটি হলো ‘সঙ্গে থাকা’র বাতিল অর্থ। এ বাতিল অর্থটিকে প্রাচীন জাহমিয়া সম্প্রদায় ও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ বলেনি। এই জাহমিয়া সম্প্রদায় বলেছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সত্তাসহ সকল স্থানে আছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের এ কথা থেকে পবিত্র ও ঊর্ধ্বে। ‘বড় মারাত্মক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। মিথ্যা ছাড়া তারা কিছুই বলে না!’ *(সূরা আল কাহ্ফ: ১৮: ৫)*

তাদের এ কথাকে সালাফগণ অস্বীকার করেছেন। ইমামগণ অস্বীকার করেছেন; কেননা এ কথার এমন কিছু বাতিল দাবি আছে যা আল্লাহ তা‘আলাকে অপূর্ণাঙ্গ বলে গুণান্বিত করে। আল্লাহ তা‘আলা যে মাখলুকের ঊর্ধ্বে আছেন তা অস্বীকার করে।

কোনো ব্যক্তি এটা কি করে বলতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সত্তাসহ সকল স্থানে আছেন অথবা তিনি তাঁর মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছেন। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র মহান যিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে

আছে। *(সূরা আল বাকারা: ২: ২৫৫)*

﴿وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ﴾ [الزمر: ٦٧]

অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। *(সূরা আয্-যুমার: ৩৯: ৬৭)*

পঞ্চমত

এই 'সঙ্গে থাকা' আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের ঊর্ধ্বে থাকা এবং আরশের ওপরে থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্যে নিরঙ্কুশ ঊর্ধ্বতা প্রমাণিত, হোক তা সত্তাগত অথবা সিফাতগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ۝٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

আর তিনি সুউচ্চ, মহান। *(সূরা আল বাকারা: ২: ২৫৫)*

তিনি অন্যত্র বলেন:

﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ۝١﴾ [الاعلى: ١]

তুমি তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ কর। *(সূরা আল আ'লা: ৮৭: ১)*

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٦٠﴾ [النحل: ٦٠]

আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ৬০)*

আর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, আকল এবং ফিতরতের দলিল এ ব্যাপারে একত্র হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বোর্ধ্বে।

এ ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর দলিল তো গুণে শেষ করার মতো নয়। যেমন:

﴿فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ ١٢﴾ [غافر: ١٢]

অতএব হুকুম কেবল আল্লাহ তা'আলার যিনি সুউচ্চ, সুমহান। *(গাফের: ৪০: ১২)*

﴿ وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ﴾ [الانعام: ١٨]

আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান। *(সূরা আল আনআম: ৬: ১৮)*

﴿ أَمۡ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَسَتَعۡلَمُونَ كَيۡفَ نَذِيرِ ١٧﴾ [الملك: ١٧]

যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠানো থেকে তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ? *(সূরা আল মুলক: ৬৭: ১২)*

﴿ تَعۡرُجُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيۡهِ﴾ [المعارج: ٤]

ফেরেশতাগণ ও রূহ ঊর্ধ্বগামী হয় আল্লাহর পানে। *(সূরা আল মাআরিজ: ৭০: ৪)*

﴿ قُلْ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ ﴾ [النحل: ١٠٢]

বল, রূহুল কুদস (জীবরীল) একে (কোরআন) তোমার রবের পক্ষ হতে নাযিল করেছেন। *(সূরা আন্-নাহল: ১৬: ১০২)*

এ জাতীয় আরো বহু আয়াত।

আর হাদীস থেকে দলিল হলো- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»

তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত ভাববে না, আর আমি হলাম যিনি আকাশে আছেন তার বিশ্বস্ত।[৫৯]

«والعرش فوق الماء، والله فوق العرش»

আরশ হলো পানির ওপর, আর আল্লাহ হলেন আরশের

---

[৫৯] - এ হাদীসটির তথসূত্র পূর্বে গিয়েছে।

ওপর।[৬০]

«ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»

উত্তম ব্যতীত অন্যকিছু আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বারোহণ করে না।[৬১]

হাদীস থেকে আরেকটি উদাহরণ হলো, আরাফার দিন আকাশের দিকে ইশারা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اللّٰهُمَّ اشهد (হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।)[৬২]

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম যখন স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের বিধান পৌঁছে দিয়েছেন, তখন তাদের এ স্বীকারোক্তির ওপর আকাশের দিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী থাকতে বলেছিলেন।

---

[৬০] - তাবারানী, আল কাবীর (৯/২২৮); ইবনে খুযায়মা, আত-তাওহীদ : হাদীস নং ৬৪৯ এবং ১৫০; বাইহাকী, আসমা ওয়াস সিফাত, পৃ. ৪০১; আয-যাহাবী, আল উলুউ, পৃ. (৬৬৪); ইবনুল কাইয়েম তার 'ইজতিমাউল জুয়ুশ আল ইসলামিয়া' গ্রন্থে এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন, পৃ. (১০০)।

[৬১] - বুখারী তাওহীদ অধ্যায়, হাদীস নং (৭৪২৯)

[৬২] - এ হাদীসটির তথ্যসূত্র পূর্বে গিয়েছে।

হাদীস থেকে আরেকটি উদাহরণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলেছিল, তিনি আসমানে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথাকে মেনে নিয়ে বললেন: তাকে আযাদ করে দাও, সে মুমিনা।

এ ছাড়াও আরো অন্যান্য হাদীস।

ইজমা

ইজমার ব্যাপারে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সর্বোর্ধ্বতার ব্যাপারে একাধিক আলেম ইজমা সম্পন্ন হওয়ার কথা বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সর্বোর্ধ্বতার ব্যাপারে আকল বা যুক্তিগত দলিল হলো এই যে, সর্বোর্ধ্বতা হলো পূর্ণাঙ্গতাবাচক একটি গুণ, আর নিম্নতা হলো অপূর্ণাঙ্গতাবাচক একটি গুণ। আর আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গতার গুণে গুণান্বিত এবং অপূর্ণাঙ্গতার গুণ থেকে পবিত্র।

ফিতরাতের দলিল হলো: এমন কোনো দো'আ-প্রার্থনাকারী নেই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকার সময় যার অন্তরাত্মা ঊর্ধ্বমুখি হয় না, যদিও কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে তার কোনো পড়াশোনা না থাকে, যদিও কোনো শিক্ষক

তাকে শিখিয়ে না থাকে।

অকাট্য দলিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রমাণিত এই ঊর্ধ্বতার সাথে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মাখলুকের সঙ্গে থাকার কোনো সংঘর্ষ নেই। আর তা কয়েক কারণে:

প্রথমত: আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে- যা বৈপরীত্য থেকে মুক্ত - এ দুটি বিষয়কে নিজের জন্য একত্র করে উল্লেখ করেছেন। অতএব এ দুটি যদি সাংঘর্ষিক হতো তবে আল কুরআন এ দুটোকে একত্র করে উল্লেখ করত না।

আর আল কুরআনের কোনো বিষয় যদি আপনার কাছে বৈপরীত্যপূর্ণ বলে মনে হয়, তাহলে তা বারবার ঘেঁটে দেখুন, যতক্ষণ না আপনার কাছে বিষয়টি পরিস্কার হয়ে না যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ۝٨٢ ﴾ [النساء: ٨٢]

তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত। *(সূরা আন্-নিসা: ৪: ৮২)*

দ্বিতীয়ত

‘সঙ্গে থাকা’ এবং উচুতে থাকা সৃষ্টিবস্তুর জন্যেও সম্ভব। যেমন চাদ। অতএব কেউ যদি রাতের বেলায় পথ চলার সময় বলে আমরা এ অবস্থায় চলছি যে, এখনো চাদ আমাদের সঙ্গেই আছে, তবে এটাকে বিপরীতমুখী কথা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হবে না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা পথ চলে তারা জমিনে, আর চাদ হলো আকাশে। অতএব যদি একটি মাখলুখের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয় তবে যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ কেন সম্ভব হবে না।

‘বরং চাদ আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন, সে আল্লাহর ছোট্ট মাখলুকের মধ্যে একটি। সে মুসাফির এবং অমুসাফিরের সঙ্গে আছে তারা যেখানেই থাক না কেন।’ ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. এর এ কথার ব্যাখ্যায় শাইখ মুহাম্মদ খালীল আল হাররাস বলেন, ‘তিনি চাদের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন যা আকাশে স্থাপিত। চাদ মুসাফির ও অমুসাফির সবার সঙ্গেই আছে, তারা যেখানেই থাক না কেন। যদি এটা চাদের বেলায় সম্ভব হয় যা আল্লাহ তা‘আলার ছোট্ট মাখলুকের মধ্যে একটি, তাহলে যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত, যিনি তাঁর বান্দাদের সকল বিষয় জানেন এবং তাদের সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, যার হাতে আকাশ ও পৃথিবী ও সমগ্র মহাবিশ্ব ঠিক আমাদের

হাতে থাকা ছোট্ট একটি গুটির মতো, তাঁর ব্যাপারে কি এটা বলা ঠিক হবে না যে তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে আছেন যদিও তিনি তাদের ঊর্ধ্বে, তাদের থেকে আলাদা এবং আরশের ওপরে?'[৬৩]

তৃতীয়ত: যদি ধরে নিই যে ঊর্ধ্বতা এবং সঙ্গে থাকা এ দুটি বিষয় কোনো মাখলুকের ক্ষেত্রে একত্র হওয়া সম্ভব নয়, তবে এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তা সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রেও অসম্ভব; কারণ আল্লাহ তা'আলা হলেন উদাহরণহীন। তাঁর মতো কোনো জিনিস নেই।

﴿ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ ﴾ [الشورى: ١١]

তাঁর মত কিছু নেই, আর তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৬৪] *(সূরা আশ-শূরা:১১)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. আল আকীদা আল ওয়াসিতিয়া গ্রন্থে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মাখলুকের নিকটতা ও সঙ্গে থাকার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় যা এসেছে তা আল্লাহর সর্বোর্ধ্বতা ও সর্বোচ্চতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ সকল গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হলেন

---

৬৩ - শায়খ মুহাম্মদ খালীল আল হাররাস, শারহুল আকীদা আল ওয়াসেতিয়া, পৃ. ১১৫

৬৪ - দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে আমীন আশশানকিতী, আদওয়াউল বয়ান, ------

উদাহরণবিহীন। তিনি নিকটে থাকা সত্ত্বেও সর্বোর্ধ্বে, কাছে থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চতায়।’[৬৫]

এ বিষয়ে খোলাসা কথা হলো:

১. আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকার কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

২. সঙ্গে থাকার বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলার জন্য উপযোগিভাবে প্রকৃত অর্থেই এবং তা কোনো মাখলুক কর্তৃক অন্যকোনো মাখলুকের সঙ্গে থাকার সদৃশ নয়।

৩. আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর বান্দাদের সঙ্গে থাকার দাবি হলো, তিনি তাদের পরিবেষ্টন করে আছেন তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা, শ্রবণ ও দর্শন দ্বারা, আধিপত্য ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা এবং রুবুবিয়াতের অন্যান্য অর্থে, যদি সঙ্গে থাকার বিষয়টি অনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হয়। আর যদি সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি অথবা গুণের সঙ্গে থাকার কথা উল্লিখিত হয় তখন ওপরে বর্ণিতভাবে সঙ্গে থাকার পাশাপাশি সাহায্য-সমর্থন করা, তাওফীক ও সঠিক পথ দেখানো ইত্যাদিও সঙ্গে থাকার অর্থে সন্নিবিষ্ট হবে।

৪. সঙ্গে থাকা এটা দাবি করে না যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর

---

[৬৫] - শারহুল আকীদা আল ওয়াসেতিয়া, পৃ. ১১৬

মাখলুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকেন অথবা তাদের স্থলে অবস্থান করেন। ‘সঙ্গে থাকা’ কোনোভাবেই এ অর্থ বুঝায় না।

৫. ওপরে যা বর্ণিত হলো তা যদি অনুধাবন করে দেখি তবে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক প্রকৃত অর্থে তাঁর মাখলুকের সঙ্গে থাকা এবং প্রকৃত অর্থে আরশের ওপরে থাকা এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। পবিত্র মহান আল্লাহ তা‘আলা যার প্রশংসা করে আমরা শেষ করতে পারব না, তিনি নিজে যেভাবে নিজের প্রশংসা করেছেন তিনি ঠিক সে রকমই। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি।

আল্লাহর মুখাপেক্ষী মুহাম্মাদ সালেহ আল উছাইমীন কর্তৃক রচিত।

তারিখ: ২৭/১১/১৪০৩ হি.

স মা প্ত